এক মহিলার ছবি

সৈয়দ শামসুল হক

সূচিপত্র

১. নাসিমা ভাবলো..2

২. হামেদ তখন ঘুমিয়ে ছিল..36

৩. একটা অন্ধকার পথ পড়ল..70

৪. উজ্জ্বল রোদে সারা বুড়িগঙ্গা..101

১. নাসিমা ভাবলো

নাসিমা ভাবলো, এখন নাইতে পারলে অনেকটা সুস্থ অনেকটা হালকা বোধ করতে পারত সে। যখনি সে গেছে যেখানে, নাইবার সুবিধে না থাকলে টিকতে পারেনি এক মুহূর্ত। পালিয়ে এসেছে। পালিয়ে এসেছে সারাটা গায়ে অদৃশ্য কাদার, থুতুর আলপনা নিয়ে। পালানো, শুধু পালানো। এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক মানুষ থেকে অন্য মানুষ, তৃষ্ণায়। শুধু তৃষ্ণায়।

থুতু আর থুতু। গান নেই, প্রীতি নেই। কাদা আর কাদা।

আরজু ঢাকায় থাকলে তাকে সে কপালে চুমো খেত তার এই বাসার জন্যে, যেখানে তুমি নাইতে পারো ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত পা প্রচুর এলিয়ে, কুয়াশা কাঁচের ভেতর দিয়ে আসা। দুধ-রোদে সারাটা শরীর ডুবিয়ে-ঠাণ্ডায়, আরো ঠাণ্ডায়।

কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকও হয়নি সে দিনের দ্বিতীয় অবগাহন সেরে ফিরেছে। তাছাড়া সময়টাও শীতের মাঝামাঝি। তাই তৃতীয়বার তাকে এই লোভনীয় শীতলতা টানলেও নাসিমা দ্বিধা করলো। তবু নাসিমা আবার নাইতে গেল। ফিরল যখন, তখন টেবিল ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে।

নতুন করে আবার প্রসাধন করতে বসলো সে।

আরজুর রুচি আছে, আছে রুচি মেটানের জন্যে উদার স্বামী। ইউনিভার্সিটির ক্লাশ পড়ানো ছাড়াও যার আরেকটা কাজ আরজুকে ভালোবাসা।

আচমকা গলায় হাত থেকে পাউডারের তুলিটা কেঁপে গেল।

মতির মা দরোজার কাছে উঁকি দিয়ে বলছে, চা দেব?

প্রশ্নটা আবার করে মতির মা। কোরে, মিষ্টি মিষ্টি হাসে। এ হাসিr অর্থ প্রথম দিনেই জানা হয়ে গেছে নাসিমার। বলতে চায় কৌতুকে—-আবার নেয়েছ তুমি?

নাসিমা আখতার, ডুব দাও আরো অতলে।

আজ আটদিন হলো ঢাকায় আরজুদের এখানে সে উঠে এসেছে। আর সে পৌঁছুবার ঠিক পরদিনই কক্সবাজার চলে গেছে আরজু, তার স্বামী আর বাচ্চা মেয়েটা। নাসিমা এসেছিল হঠাৎ কোনো খবর না দিয়ে, তাই আরজুদের বেরুনোর তারিখ বদলানো সম্ভব হয়নি। আরজু বলেছিল, তুই থাক, আমরা দিন দশেকের বেশি থাকব না। তারপর গল্প করা যাবে, কী বলিস? তুইতো আমাদের এমন ভুলে গেছিস যে তিন বছরে একটা খবরও নিসনি। না, না, তুই যেতে পারবিনে। ঢাকায় এসেছিস, আমার এখানেই থাকবি। আগে জানলে আমরা না হয় দুদিন পরেই যেতাম। উনি সব টিকিট-ফিকিট কিনে ফেলেছেন। একলা থাকতে পারবি না?

আরজুও জানে, নাসিমাকে প্রশ্নটা করা শুধু কিছু একটা বলার জন্যেই। একাকীত্ব যার জন্ম-সহোদর এ প্রশ্ন তার কাছে অর্থহীন। তবু সে বলেছে, পারব। কেন পারব না?

বরং এতে খুশিই হয়েছিল নাসিমা। এই ভালো হলো! সারাটা বাড়িতে একটা সাজানো সংসারে সে একা থাকবে—-হোক মাত্র কয়েকদিনের জন্য—-এই ভালো হলো, এই মুক্তিই সে তার ঈশ্বরের কাছে চেয়েছিল আজ– করাচি থেকে তার প্লেন যখন লাফিয়ে উঠেছিল আকাশে, সেই তখন থেকে। সমস্ত বাড়িঘর পৃথিবী আর ঘাস পায়ের তলায় বিলীন হয়ে যেতে যেতে তাকে যেন পাঠিয়ে দিচ্ছিল এমনি একটা পরিবেশে, যেখানে কেউ তাকে জানবে না, যেখানে যারা চেনা তারাও যাবে চলে, যেখানে তাকে একটা একটা করে সমস্ত কিছু ক্লান্ত দুচোখ দিয়ে আবিষ্কার করে নিতে হবে।

নাসিমা তখন চোখ ভরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরজুর সারাটা সংসার দেখার প্রেরণা অনুভব করেছিল। যে দ্রুত আকাশযান তাকে নিয়ে এসেছে এই দীর্ঘপথ ঠিক তারই মত অনায়াস একটা ধাতবগতি সঞ্চারিত হলো তার অনুভূতিতে সে অনুভূতি চলেছে দ্রুত কিন্তু তার প্রেক্ষিত অপসারিত হচ্ছে মেঘমন্থর রীতিতে। ডুব দাও অতলে, আরো অতলে।

.

এরোপ্লেন আকাশপথে তার দিশারী নীলরেখায় পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সিটবেল্টা খুলে ফেলল নাসিমা আখতার। অদ্ভুত একটা শিরশির সুরভি জড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া সারাটা প্লেনের

গহ্বর আচ্ছন্ন করে আছে। আর একটানা একটা ধ্বনি, নাসিমার হৃদস্পন্দনের মত ধুকধুক, নিয়মিত, দায়িত্বশীল।

নাসিমার পাশের সিটে বসেছে বছর এগারোর একটা ছেলে। মাথায় বাদামি রঙ চুলের দুষ্টুমি ছেলেটার রক্ত উজ্জ্বল সারাটা মুখের সঙ্গে প্রীতিময় হয়ে আছে। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। এয়ারপোর্টে ছেলেটাকে তুলে দিতে এসেছিল বোধ হয় কোন নিকট আত্মীয়। অনর্গল কথা বলছিল ছেলেটা তার সঙ্গে। সেই তখনই নাসিমার চোখে পড়েছিল। এখন বসেছে ঠিক তার পাশে। আত্মীয়টি তাকে টফি কিনে দিচ্ছিল আর মাথায় আঙ্গুল দিয়ে ব্রাশ করছিল তার। নসিমা একটা মোচড় অনুভব করছিল তার বুকের ভেতর। ছেলেটার দ্রুত দুহাতে ছিঁড়ে ফেলা টফির সিলোফেনের মত তার হৃদয়ের পর্দাগুলো যেন কোথাও একটা অদৃশ্য হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

প্লেনে ওঠবার যখন সময় হলো তখন, না তখন নয় তার কিছু আগেই, ছেলেটা কেমন নিভে গেল। আত্মীয়টি আধে: উবু হয়ে তার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, ডোন্ট ক্রাই বব, ইউ আর গোয়িং টু ইওর ড্যাড–- উওর নিউ মম–ইওর ফাদারস বিগ ব্রাদারস গার্ল—-দে আর ওয়েটিং ফর ইউ। ডোন্ট ক্রাই, ডোন্ট ক্রাই।

ছেলেটার চোখে আঙটির পাথরের মত অশ্রু টলটল করছে।

নাউ বি এ ব্রেভ বয়। সে গুডবাই। নাউ–ডোন্ট লুক ব্যাক–গো অন।

ভিড়ের ভেতরে ডুবে যেতে যেতে নাসিমাব মনে হলো, ছেলেটা কি পেছনে তাকিয়েছিল? কিন্তু ফিরে সে দেখল না। ডোন্ট লুক ব্যাক। নাসিমা প্লেনের গহ্বরে চলে যেতে যেতে একবারও তাকায়নি পেছনে। আমরা কেউ কখনো তাকাই না অতীতের অন্ধকারের দিকে। কিন্তু অতীত তার দুই গভীর চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে আমাদের চলমান মিছিলের দিকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম নাসিমার কপালে একসার ফৌজের মত স্থির হয়ে থাকে। প্লেন তখন টেক অফ করছে। সারা শরীরে হঠাৎ একটা শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসিমা মুহূর্তের জন্য নিজেকে যেন ফিরে পেল। মনে হলো, এমন একটা শূন্যতার বিনিময়ে সে আজ তার সমস্ত দুয়ার খুলে দিতে পারে। এই অতল শূন্যতা দিয়ে বাহিত হয়ে যাওয়া অনেক ভালো, মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার তীরে রক্তাক্ত হওয়ার বদলে।

নাসিমা আখতার আবিষ্কার করে এই বিরাট ধাতব পাখির প্রাণ–যন্ত্রের সঙ্গে তার হৃদস্পন্দন এখন এক, অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। এ এক অদ্ভুত আত্মীয়তা, এর কোনো ইতিহাস নেই, আজই যেন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো এই আত্মীয়তার সূত্র। চলছে, এগিয়ে চলছে। হ্রদে ঢেউয়ের মত চলছে তারা। সমস্ত যান জুড়ে কাঁপছে একটা মৃদু তরঙ্গ। আর তেমনি তরঙ্গ কাঁপন তুলছে আমার চেতনায়। এখন, এই মুহূর্তে, যদি সে থেমে যায় তাহলে নির্বাপিত হবো আমিও। আমি বিশ্বাস দিয়েছি এই আকাশযানকে।

কিন্তু দিয়েছে কি সবাই? প্রতিটি যাত্রী? সুখী মসৃণ মানুষের ভিড়। নাসিমা দৃষ্টি করে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, যেখানে মুঠোর মত প্যাসেজটা সরু হয়ে এসেছে।

নাসিমার মনে হলো একপাল ভিন্ জাতের প্রাণীদের ভেতরে কেউ তাকে জোর করে পুরে দিয়ে দরোজা দিয়েছে সেঁটে।

একমাত্র পাশের ছেলেটা কী সূত্রে তার মনের কাছে আপন হয়ে উঠেছে তা সে নিজেই জানে না। ছেলেটা তখন জানালা দিয়ে অপসৃয়মাণ নিচের পৃথিবীকে তাকিয়ে দেখছে টফি খেতে খেতে। নাসিমার মনে হলো পৃথিবীর সুন্দরতম একটা ড্রয়িং ঈশ্বর ধরে রেখেছেন। পাশ দিয়ে হোস্টোস যাচ্ছিল। নাসিমা তাকে ডাকলো। পলকে সুন্দর মুখখানা ফিরিয়ে স্বচ্ছ গলায় শুধালো একটু ঝুঁকে পড়ে, ইয়েস মাদাম। নিড এনি হেল্প।

নাসিমা তাকে আদৌ ডেকেছিল কি? আর যদি ডেকেই থাকে, তাহলে হয়ত সে শুধোতে চেয়েছিল, সে ভাবলো—-যদি প্লেনটা হঠাৎ জ্বলে ওঠে, আগুন ধরে যায়, তাহলে তাহলে কী হবে হোস্টেস?

তাহলে তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে এই অসীম মনে রাখার দায় থেকে, আর পাথরের মত এক মুহূর্তে জমে কঠিন হয়ে যাবে রক্তঝরার অদৃশ্য সেই উৎস।

মনের ভাবনাটা কখন কথা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নাসিমা বুঝতে পারেনি। বিস্ফারিত চোখে সে শুধু দেখল, সে হোস্টেসের দুই বাহুমূল শক্ত মুঠোয় ধরে আছে। আর সেই সবুজবসনা নত হয়ে আস্তে আস্তে তার পায়ের কাছে বসে শুধোচ্ছে, ডিড ইউ সে সামথিং মাদাম?

নো নো আই হ্যাভন।

নাসিমার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। একটু পরে বলে, আই নিড স্লিপিং ট্যাবলেটস—-দ্যাটস অল। ক্যান ইউ গেট মি সাম?

ইয়েস, অফকোর্স।

পায়ের তলায় পৃথিবীর একশো আশি ডিগ্রী ব্যাপ্তি কেবলি পেছনে সরে যাচ্ছে। আর আমার ফুসফুঁসে যন্ত্রের বানানো বাতাস। ধাতব পাখির যে অবিরাম গর্জন ছিল যাত্রার শুরু থেকে তার সহচর, একটু আগে তা কোন জাদু বলে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। হোস্টেস চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই গর্জনটা যেন দ্বিগুণ হয়ে চিতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল নাসিমার শ্রুতিতে।

পাশ থেকে ছেলেটা হঠাৎ শুধালো বাদামি চোখ চঞ্চল করে, আর ইউ স্কেয়ার্ড?

হাসলো নাসিমা। হাসির রেখা তার মুখাবয়বকে নতুন করল।

নো, আই অ্যাম নট, ডার্লিং।

বাট শি সেড—-ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে স্লিপিং ট্যাবলেট নিয়ে আগতা হোস্টেসকে ইঙ্গিত করল—-ইউ আর।

নাসিমা ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাবলেট আর পানি নিল হোস্টেসের হাত থেকে। তারপর হোস্টেস চলে গেলে ফিসফিস করে বলল, শি লাইজ।

ছেলেটা কৌতুকে হেসে উঠলো। নাসিমা শুধালো, বাট ইউ আর নট স্কেয়ার্ড।

হঠাৎ একটা দায়িত্ব ফুটে উঠলো ছেলেটার কণ্ঠে, নো। মাই আঙ্কল সে আই অ্যাম এ ব্রেভ বয়।

বাট ইউ আর, ডার্লিং।

তাহলে লোকটা ওর চাচা, কিংবা মামা, কিংবা ফুফাও হতে পারে। আস্তে আস্তে কথা জমে উঠলো ছেলেটার সঙ্গে নাসিমার। ডাক নাম— বব, ভালো নাম আসাদ রেজা চৌধুরী। ববের বাবা ঢাকার নামকরা ব্যারিস্টার। সেই ইনে থাকবার সময় বিয়ে করে এনেছিলেন বিদেশিনীকে। কিন্তু দেশে ফেরার বছরখানেকের মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠল একটা ফাটল–চিহ্ন দিনে দিনে। লন্ডনে ফিরে গেল ববের মা দুবছরের ববকে নিয়ে। বিদেশিনী এবার বিয়ে করলো তার স্বদেশেই। আট বছর বয়সে বব এলে করাচিতে আঙ্কলের কাছে। তার বাবার চাচাতো ভাই। নতুন ড্যাড তাকে একটুও ভালোবাসত না। কিন্তু মা পাঠাতে চায় নি ব্যারিস্টার চৌধুরীর কাছে, কেননা সেও ততদিনে দ্বিতীয়বার স্ত্রী নিয়েছে। অবশেষে করাচির নিঃসন্তান আঙ্কল কোলে তুলে নিয়েছে ববকে।

নাসিমা বুঝতে পারে, বাবা তাকে আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ধরে রাখতে পারেনি। বব বলল, আই উইল কাম ব্যাক টু মাই আঙ্কল। আই হেট মাই ফাদার! আই হেট হিম। অভিমানে ববের চোখ সজল হয়ে উঠলো। চোখ নামিয়ে সে সমুখের ছাইরঙা কুশনে লাথি ছুঁড়তে লাগলো আস্তে আস্তে।

আর নাসিমা তার পায়ের দিকে তাকিয়ে পাথরের মত বসে রইলো। একটু পরে বব সিটে হেলান দিয়ে নাসিমার উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইলো এতটুকু একটা পাখির মত। ঘুম এলো না নাসিমার। দুচোখ ভাব শুধু ঘুমের আর্তি। আর কিছু নয়। চব্বিশ বছর বয়সে যখন তার বিয়ে হয়েছিল সেই লোকটার সঙ্গে, তখন থেকে ঘুমের ওষুধ তার অভ্যেস হয়ে গেছে। আজকাল তিনটে ট্যাবলেট না হলে নাসিমার ঘুম আসে না। কিন্তু হোস্টেস দিয়ে গেছে একটা। শুধু একটা। এতে এমনকি তাও এলো না তার। কেবলি পেছনে ফেলে আসা। গ্রাম, ফসল, শহর আর পার্কের বৃক্ষবীথি আর ক্লিফটনের বালুকাবেলা। বব, ইউ আর এ ব্রেভ বয়—-বব, ইউ আর গোয়িং টু ইওর ড্যাড–বব–বব।

বব। ডাকলো নাসিমা।

তাকিয়ে দেখল বব নিস্পন্দ পড়ে আছে। শিথিল হয়ে এসেছে তার সারাটা শরীর। সমস্ত মুখে একটা অভিমান ফসিল হয়ে আছে।

চোখ বিস্ফারিত হয়ে এলো নাসিমার। তলিয়ে গেল এঞ্জিনের গর্জন। তার হৃদপিণ্ড কে যেন ছুঁড়ে ফেলে একতাল বরফ গুঁজে দিল বুকের ভেতর। নাসিমা চিৎকার করে উঠল, বব ইজ ডেড।

ঝনঝন করে চারদিকে বেজে উঠলো সেই কণ্ঠ।

যাত্রীদের সচকিত চোখ উৎস খুঁজে বের করার আগেই ছুটে এলো হোস্টেস।

হি ইজ ডেড। আসক দেম টু স্টপ দ্য ফ্লাইট।

ববের বুকে হাত রেখে হোস্টেস ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল, দ'বয় ইজ স্লিপিং।

তারপর ববকে আরো ভালো করে শুইয়ে ডান হাত তার পাজরের চাপ থেকে বের করে বুকের ওপর বিছিয়ে দিয়ে হোস্টেস সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, আই অ্যাম সরি, ইউ নিড রেস্ট, মাদাম।

হ্যাঁ, আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। আর বিস্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারের মত বিন্দু বিন্দু করে সমস্ত কিছু সে তার লোমশ ধূসর থাবায় তুলে নেয়।

থুতু আর কাদা। তবু তৃষ্ণা।

আমাকে ভুলে যেতে দাও। আমি বড় ক্লান্ত। জীবন নয়, মৃত্যু নয়—- আমি আর কিছুতেই বাঁচি না। আমি শুধু প্রবাহিত হতে পারি এই দীর্ঘ বাতাসের করতালি পেরিয়ে, বাসনার চতুরালিকে তুচ্ছ করে অথবা না পেরিয়ে, অথবা তুচ্ছ না করে, কেননা কিছুতেই কিছু এসে যায় না।

আরজুর সংসার আবিষ্কার করার কাজটা টিকে ছিল মাত্র একটা দিন। ওদের চলে যাওয়ার পর দিনটাই শুধু। সেই একটা দিনে দেখা হয়ে গেছে সব—- ভেতর বার, অন্তরংগ, ইতস্তত সব কিছু। এমনকি এ বাসার প্রতিটি কোণ তার চেনা হয়ে গেছে। পুরনো হয়ে গেছে। মনে হয়েছে যেন তার জন্মের পর থেকে আজ এই বত্রিশটি বছর সে কাটিয়ে দিয়েছে এখানে। অথচ একাকীত্বের প্রথম মুহূর্তটা মনে হয়েছিল হঠাৎ পাওয়া একটা গিনির মত।

আরজু তার মেয়েকে নিশ্চয়ই আদর করে মাত্রারও বেশি, নইলে এত কাপড় থাকে অতটুকু চার বছরের মেয়ের? আর এত খেলনা? কাপড়গুলো আলনায়, এখানে সেখানে স্তূপ স্তূপ হয়ে আছে পাঁচমিশোল রঙের ছোপের মত। দূর থেকে চোখে পড়ে। আর কী ঠাণ্ডা! একবার হাতে করে দেখেছিল নাসিমা। একটা গোলাপি ফ্রক এত মুড়মুড়ে সিল্কের তৈরি যে, আলতো করে হাতে তুলতেই খসখস করে পড়ে গেছে মাটিতে। আবার আরেকটা সবুজে চুমকি বসানো চাঁদের অনুকরণে। আরেকটা কাঁচের মত স্বচ্ছ আর অনুভব কাগজের মত। লাল, রক্তিমাভ, ভায়োলেট। আরো, আরো, আরো।

খেপে ওঠা দুহাতে নাসিমা সবগুলো ছুঁড়ে খুঁড়ে জড়ো করেছিল মেঝের মাঝখানে। কী সে। বিতৃষ্ণা তাকে ভর করেছিল কে জানে। কেবলি থেকে থেকে কে যেন মনের ভেতর বলছিল—-নোংরা, বিশ্রী, জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে ফ্যালো। কেন? কেন থাকবে এখানে এগুলো? কিন্তু কোথায় যে হবে তার স্থান, তাও স্পষ্ট নয় তার কাছে।

কাপড়গুলো একটার ওপর আরেকটা পড়ে যেন কিলবিল করতে থাকে নাসিমার চোখের সমুখে। তারপর কী মনে হয়, আগের চেয়েও দ্রুত দুহাতে সব গুছিয়ে রাখে আলনায়। একটা ক্লান্তি, শরীর থেকে শক্তির একটা অপচয় অনুভব করতে করতে নাসিমা পড়ে থাকে বারান্দায় আরাম চেয়ারে।

তারপর থেকে মনটা যেন মরে গেছে ওই আলনায় রাখা কাপড়গুলোর জন্যে। যেন আর চোখেই পড়তে চায় না নাসিমার।

সেদিন নাইবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। সেদিন সময়টা ছিল ভর সন্ধ্যে। মনের অরণ্যে যে বিরাট গাছ তার সহস্র শেকড় প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হোঁচট খেলে তার তৃক শিরশির করে ওঠে। তখন নাইতে হয়! ঠাণ্ডা পানির ধারায় নিজেকে শীতল করে তুলতে হয়। এক সময়ে যখন আর কোনো স্পর্শের বোধ থাকে না তখন সে উঠে আসে।

সেদিন নেয়ে এসে নিজের কাপড় বাছতে বসলো। কোনটাই টানলো না তাকে। তখন উঠে এলো আরজুর ওয়ার্ডরোবের কাছে। বেছে বেছে বার করল মাখনের মত নয়োম,

মুঠো করলে এতটুকু, দুধ শাদা, পাড়ছাড়া একটা শাড়ি। মনটা যে হঠাৎ শুদ্ধ সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার প্রতীক করে পরলো শাড়িখানা। কোমল ভেলভেটের লাল চটি দিল পায়ে। বাতাসের মত লঘু গতিতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল নাসিমা।

আহ, কী সুন্দর ফুল ফুটেছে আজ ওই লতানো গাছটায়! আরজুর যে ফুলের শখ তা কি জানতো নাসিমা? হয়ত এই তিন বছরের অসাক্ষাতের ব্যবধানে এই শখটা হয়েছে আরজুর। মনে আছে সেই তারা যখন কলকাতায় পড়ত কলেজে, কী এলোমেলো কাঠ–কাঠ ছিল মেয়েটা। প্রথম দিন এসে হস্টেলের ডরমিটরিতে থাকতে হয়েছিল আরজুকে। চাদরটা ময়লা ছিল ওর, নাসিমা তার নিজের ফুলতোলা চাদর ট্রাঙ্ক থেকে বের করে দিয়েছিল। সেইদিন থেকে ভাব। আরজু বলেছিল চোখ গোল করে, এত বড় ফুল চাদরে? কে করেছে?

কে আবার? আমি করেছি।

কথাটা মিথ্যে। বউবাজার থেকে শখ করে কিনেছিল সে একদিন।

ততক্ষণে আরজু শুয়ে পড়েছে বিছানায়। নাসিমা শুধিয়েছিল চোখে কৌতুক নাচিয়ে, কী, পিঠে ফুটছে?

উঁহু।

ফুটলোই বা। ফুল তো। তোমার ফুল ভালো লাগে না?

না।

সত্যি মেয়েটার সখ বলতে কিছু ছিল না তখন। ফুটপাথ থেকে কতদিন রিকশা থামিয়ে নাসিমা কোলভরে ফুল কিনে এনেছে। তার থেকে কয়েকটা স্তবক হয়ত শোভা পেয়েছে আবজুর শিথানে, কিন্তু সে নিজে কোনদিন সাগ্রহ হয়নি ফুলের জন্যে। বরং নাসিমা যখন বলত, একদিন ফুল না হলে, জানিস আরজু, মনে হয় কী একটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। ভিতরটা কেমন হাহাকার করতে থাকে সব সময়। লোকে মদ খায়, রেস খেলে, আর আমার নেশা ফুল।

তখন একটু বাড়াবাড়ি ঠেকত আরজুর।

আজ আরজুর লতানো গাছে ফুল ধরেছে। শাদা শাদা ফুল। শাদা শাদা সুগন্ধের অস্পষ্ট কুচি। বুক ভরে ঘ্রাণ নিল নাসিমা।

মতির মা এসে বলল, একটা চেয়ার পেতে দেব আপামণি?

দে, আর ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিস।

আলো নিভিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে ভিজে গেল বারান্দা। আর শাদা শাড়িটা ম্লান হয়ে এলো কুয়াশার মত।

মনের ভেতরে সাবেকি মেঘের যেন ঢল নেমেছে।

বসে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করছে মতির মা–র সঙ্গে! একটা মধুর বাঙালপনা তাকে পেয়ে বসছে আস্তে আস্তে। আজ আমার নতুন জন্ম, এক মুহূর্ত আমি বাঁচবো, তারপর আবার আমি মরে যাবো।

নাসিমা আবছা গলায় বলল, মতির মা, ফুল ফুটেছে দেখেছিস? ছিঁড়ে দিবি কটা?

রাতে ফুল ছিঁড়তে বারণ যে।

থাক বারণ, তুই দিবিনে? না বাপু, ঝগড়া করতে পারিনে।

অগত্যা মতির মা–কে উঠতে হয়। একমুঠো ফুল চয়ন করে হাতে দিয়ে বলে, এই নাও।

বেশ বাস ছড়িয়েছে।

কয়েকটা ফুল ওর হাতে নিয়ে নাসিমা বলে, মাথায় পরিয়ে দে।

আর বাকিগুলো দুহাত ভরে কোলের কাছে রাখে। শরীর বেয়ে লতিয়ে উঠতে চায় ঘ্রাণ। ভীষণ প্রস্তুত মনে হয় তার নিজেকে। আমাকে তুমি তোমার দৃষ্টি দিয়ে স্পর্শ কর, আমি আজ ফলসম্ভবা। যোজন দূর থেকে তুমি আজ আমাতে সঞ্চারিত হও।

মতির মা স্তব্ধতা ভেঙে বলল, আপনার সোয়ামি নাই আপামণি?

তোর কী মনে হয়?

নাই।

থাকলে বুঝি তার কাছে হাত ধরে আজ পাঠিয়ে দিতি আমাকে?

রসিকতায় মুখর হয়ে ওঠে মতির মা। সত্যি বলছ আপামণি, নাই?

.

স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে বেঁচে, বিষে জর্জর মন নিয়ে সার্কাস–রো–তে এসে নাসিমা ছিল কিছুদিন। সার্কাস রো–তে থাকত তার বড় ভাই হামেদ। তখন একটা শহরের জন্যে মনটা ভীষণ রকমে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল যে শহর হবে অনেক বড়, যেখানে থাকবে অনেক আলো, আর অনেককাল আগের পুরনো সব চেনা মানুষ। কলকাতায় তাই এক সকালে এসে হাজির হলো নাসিমা আখতার।

আসামের লাবু চা বাগান থেকে কলকাতা। শেয়ালদায় নেমে নাসিমা রক্তের ভিতর গতির একটা উন্মাদনা, শুধু কণ্ঠ আর শব্দের প্রপাত অনুভব করেছিল।

নাসিমা জানতো না হামেদ কঠিন অসুখে ভুগছে। থেকে থেকে রক্তবমি করে আর পেটে তীব্র একটা ব্যথা।

ছমাস হলো বিয়ে হয়নি এরই মধ্যে কোনো জানান না দিয়ে নাসিমাকে আসতে দেখে হামেদ বিস্মিত হয়। অসুস্থতায় কোটরাগত দুচোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে প্রশ্নে, চলে এলি যে? বেড়াতে?

না। বেড়াতে আসিনি। তোমার অসুখটা বেড়েছে আমাকে জানাও নি তো?

হামেদ বিছানা থেকে আধো উঠে বসে বলে, জানিয়েছিলাম। চিঠি পৌঁছোয় নি হয়ত। কিন্তু তুই এলি কেন?

জানিয়েছিল? তাহলে সে চিঠি তাকে দেয়া হয়নি। লাবু চা বাগানের ম্যানেজার, তার স্বামী—-সে চিঠি তার হাতে দেয়নি। হঠাৎ পুরনো কথাটা মনে পড়াতে নাসিমার সারা শরীর ঘৃণায় শিহরিত হয়ে উঠলো। জিভটা অশান্ত হয়ে উঠতে চাইল—-তুমি একটা পশু

উচ্চারণ করবার জন্যে। নাসিমা মুখে বলল, ভাবী কই? দেখছিনে।

রায়টের জন্যে উঁচড়োয় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর আনা হয়নি।

আর একা তুমি অসুখে এখানে মরছ?

এতক্ষণে ম্লান হাসলো হামেদ। বলল, একা কই? তাছাড়া আমার ট্রিটমেন্ট দরকার, তাই কলকাতায় পড়ে আছি।

চাকর বাকর কেউ নেই?

আছে, থাকবে না কেন? নূরুকে তুই বোধ হয় দেখে গিয়েছিলি। ও-ই আছে।

বলতে বলতে হয়ত ব্যথাটা উঠে থাকবে হামেদের। ঠোঁটের দুপাশে শক্ত একটা কুঞ্চন পড়ল এক মুহূর্তের জন্যে।

নাসিমার হাসি পেল হামেদও একা থাকতে চায়। তুমি আমার সহোদর। আজ নতুন করে তোমার সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ হলো।

নাসিমা বিছানার পাশ থেকে উঠে আসতে আসতে বলল, এখন থেকে আমি কলকাতায় থাকব। তোমার এখানে।

.

বিকেলে বেরিয়ে নাসিমা খুঁজে খুঁজে প্রথমেই পেল বিনতাকে। বিনতা আজো তেমনি সুন্দর আছে, তেমনি গৌর, সজ্জায় তেমনি নিপুণ। একটা লাল পেড়ে মিলের শাড়ি পরেছে। মাথায় একটু সিদুরের আভাস। আর খালি পা দুখানা মেঝের সঙ্গে প্রীতিময় হয়ে আছে। সব মিলিয়ে বিনতার অপূর্ব শ্রী মুগ্ধতাকে আহরণ করল।

বিনতা তাকে দেখে খুশি হয়ে উঠলো। মোড়ায় বসে মাই দিচ্ছিল খোকাকে, কাপড় টেনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওমা, বেঁচে আছিস তুই?

তুই কি মনে করেছিস, মরে গেছি! তোর খোকা?

মাই টানছে দেখতে পাচ্ছিস না!

বিনতা খোকার দিকে স্নেহদৃষ্টি করে। প্রশ্ন করে, তোর বুঝি হয়নি?

না।

লাবু চা বাগানে ফেলে আসা ঘৃণা তাকে শিহরিত কবল আবার স্থলিত কণ্ঠে একটু পরে সে যোগ করল, আমি চাই না। তারপর তোর কী খবর বল।

ভালো। সব ভালোই।

গান?

আজকাল আর গাই না।

তারপর একটু হেসে খোকাকে মেঝেয় বসিয়ে বলল, গাইব কী? এই নিয়ে তিনটে হলো, এখন এরাই আমার আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেন ডাক্তার শুনছে রোগীর বিবরণ এমনি একটা মনোযোগ ধরে রাখে নাসিমা। বলে, তাই বলে গান ছেড়ে দিবি?

দিলাম।

সহজ কণ্ঠে বিনতা কথাটা বলে। বলে হাসতে থাকে।

সুবোধবাবু—- সুবোধবাবু কিছু বলেন না?

সুবোধকে অনেকদিন আগে দেখেছিল নাসিমা। চেহারাটা স্পষ্ট করে মনে নেই। কেবল মনে আছে নাকের নিচে একটা কালো তিল ঢাকবার জন্যে ভদ্রলোক মোটা করে গোঁফ রাখতেন।

সেই নিয়ে বিয়ের পর বিনতার কৌতুকের অন্ত ছিল না।

বিনতা বলে, সুবোধবাবু কী বলবেন? দোষটা কি তারই নয়?

কেন?

একটা স্পষ্ট আশঙ্কা কালো হয়ে ওঠে নাসিমার চোখে।

কেন আবার? ওর জ্বালাতেই তো এত দুর্ভোগ। নইলে থাকতাম ঝাড়া হাত পা। এত কষ্ট করে বাবা গান শিখিয়েছিলেন, শেষ অবধি দেখতাম।

নাসিমার তবু মনে হয় বিনতা অসুখী নয়। যে বিনতা এককালে এত ভালো গান গাইত, যার গান শুনে ইউনিভার্সিটির ছেলেরা ভিড় করত এক সময়ে চারপাশে, সেই বিনতা গান ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেয়ার খেদ যতটুকু আছে কণ্ঠে, মনে তার ছায়াটুকুও নেই।

নিঃশ্বাস ছেড়ে নাসিমা বলল, বেশ আছিস তুই।

আর তুই? চা বাগানে যেতে আমার এত শখ। নিয়ে যাবি একবার?

বলতে পারে না নাসিমা, আমি আর কোনদিন সেখানে ফিরে যাবো না, বিনতা।

বিনতা বলে, বাইরেই বসে থাকবি নাকি? চল, ভেতরে চল। আমার শেষ রেকর্ডখানা তুই বোধ হয় শুনিসনি। শুনবি চল।

নাসিমা ওর সঙ্গে উঠে আসে শোবার ঘরে। খোকা তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দুর্বোধ্য—- করতে থাকে। বিনতার কাঁধ লালা দিয়ে বার্নিশ করে দেয়। ভারী দুষ্টু হয়েছে তো!

কী নাম রেখেছিস ওর?

চপল।

বাপের মত হয়েছে দেখতে?

কী জানি।

চোখ আর থুতনিটা কিন্তু তোর মত।

তাই নাকি?

ঘরের ভেতরে ঢুকে নাসিমা বলে, বেশ সাজিয়েছিস তো।

কী আর এমন! একটা ভালো বাসাই পেলাম না আজ অবধি।

এটাই বা মন্দ কী।

দূর। বাসা হবে বাসার মত ছবির মত। চোখভরে দেখতে ইচ্ছে করবে। বোস চেয়ারটায়। খোকাকে একটু নিবি?

নাসিমা হঠাৎ লজ্জিত হয়ে যায়। সাপটে ধরে চপলকে কোলে নিতে গিয়ে টাল খেয়ে পড়ে।

বিনতা গ্রামোফোনে চাবি দিতে দিতে বলে, দেখিস হিসু করে না দেয়।

দিলেই বা।

চপল কোল থেকে নেমে যায়। নেমে গিয়ে মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়। হঠাৎ ধাবিত হয় এক টুকরো কাগজের দিকে।

বিনতা কাঁটা বসাতে বসাতে কাঁধ তুলে বলে, শোন।

ভক্ত কবিরের গান।

আমার হৃদয়কে আমি তুলে ধরেছি তোমারই গানে। আমার আর কোনো সাধ নেই। স্বপ্ন নেই, আমি তোমাতেই।

মিথ্যে, সব মিথ্যে। কখন যে সে ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল বুঝতে পারে নি। বিনতার কণ্ঠস্বরে সে চোখ তুলে তাকাল। বিনতা বলছে, কেমন শুনলি, বললি না কিছু?

ভাবছি, গান ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছিস মস্ত।

হবেও বা।

ঘরের কোণে বিনতার তানপুরো ঠেস দিয়ে রাখা। মমতা দৃষ্টিতে সেদিকে বিনতা একবার তাকাল। পরে বলল, এসে অবধি আমাকে নিয়েই পড়েছিস তুই। তোর কিছু বল।

কিছু বলার নেই, তাই।

হঠাৎ গভীর চোখে বিনতা তাকে দৃষ্টি করে। বলে, তোর কী হয়েছে বলতো? এত রোগা হয়ে গেছিস।

কই, কিছু না। চিরকাল মানুষ এক রকম থাকে নাকি। বাইরে যাস না আজকাল?

খুব কম।

চল, আমার সঙ্গে বেরুবি। দুজনে মিলে মজা করে বেড়ানো যাবে। কলকাতা এত নতুন ঠেকছে, কেউ সঙ্গে না থাকলে হয়ত পথই হারিয়ে ফেলব।

সুবোধবাবু ফিরলেন একটু পরেই। নাসিমাকে দেখে মুখর হয়ে উঠলেন। নাসিমার মনে হলো অনেকদিন পরে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে যেন সে। আর পেছনে পেছনে বিনতার বড় মেয়েটা আর মেজ ছেলে।

তারা যখন বেরুচ্ছিল, সুবোধবাবু বললেন, আজ আমার এখানেই খাবেন। বিনতা, তুমি ওকে ছেড়ে দিয়ো না যেন।

বিনতা মুখে ঢেউ তুলে বলে, আসবে, আসবে। আমার মাছের ঝোল ও যা ভালোবাসতো। মনে করেছ ও কি ফেলে যাবে? কি বলিস? ফেরার পথে তোর দাদা আর বৌদিকেও নিয়ে আসবো।

বৌদি তো নেই। চুঁচড়োয়। আর দাদার খুব অসুখ।

নাকি?

নিভে যায় যেন বিনতা।

সুবোধবাবু আবার বলেন, ওকে নিয়ে এসো কি। আজ প্রবীরও খেতে আসবে বলেছিল। বিনতা থমকে দাঁড়িয়ে মুখ গোল করে বলে, আজ নোটিশ না দিয়ে যে! দেখা হয়েছিল বুঝি?

বাবু যে রাজকর্ম নিয়ে থাকেন।

তোমার কাছে প্রবীরের আবার নোটিশ লাগবে নাকি?

ততক্ষণে ওরা পথে নেমে এসেছে।

প্রবীর সুবোধের ছোটভাই।

বিনতার কণ্ঠ যখন গ্রামোফোনে প্রথম কথা কয়ে উঠেছিল তখন নাসিমার মনে হয়েছিল বিনতা দুজন। একজন যার কণ্ঠ গান হয়ে উঠেছে, আরেকজন তার সমুখে দাঁড়িয়ে আছে। চিবুক নিচু করে। কোথাও তাদের মিল নেই। দুজন সম্পূর্ণ আলাদা।

আমাদেরও কি এমনি করে প্রতিটি মুহূর্তে মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিতে হয়? একেকটা মুহূর্ত আমি পেরিয়ে আসি, আর পেছনের আমাকে মনে হয় অন্য নারী তার জীবন, তার আত্মা, তার পরিবেশ আমার নয়। আমি অনেক আমি—-এই কথা আর কেউ জানবে না। আমি যে নাসিমা নই, কোনদিন তা জানবে না বিনতা—- সুবোধবাবু, প্রবীর, কেউ না।

আমার মৃত্যু হয়েছে। আজকের যে আমি তার জন্ম হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, কলকাতায় বিনতার বারান্দায়। আমাকে কি তৈরি হতে হবে আরো অসংখ্য মৃত্যুর জন্যে?

নাসিমা তার শীর্ণ বাহু বিনতার কাঁধে রেখে শুধালো, সুবোধবাবু তোকে খুব ভালোবাসেন, না?

তুই কি দেখলি?

অনেক ভালোবাসেন তোকে।

ছেলেমানুষের মত রক্তাভ হয়ে ওঠে বিনতার মুখ।

একেক সময় কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, এত ভালোবাসার বদলে আমি ওকে কিছুই দিতে পারলাম না।

এটা তোর বাড়াবাড়ি।

মুখে এই কথাটা বলে নাসিমা, কিন্তু মনে মনে ভাবতে থাকে, তোমার আপনমকে দান করে আজ তুমি নিঃশেষিত, অদেয় কিছু নেই আর। তবু আরো দিতে হবে। তাই এ বেদনা?

নাসিমা মুখ ফিরিয়ে বলে, চল নিউ মার্কেটে যাই। কতদিন যাইনি।

কিছু কিনবি?

না এমনি।

চল, আমিও বেরোইনি অনেকদিন। আমার ভালো লাগছে বেশ। আমি ভাবতেই পারিনি তোকে নিয়ে এমনি বেড়াতে পাবো।

দুজনে এলো মার্কেটে।

বিনতা চঞ্চল দৃষ্টি করে শাড়ি দেখতে লেগে যায়। আবার চলতে থাকে। আপন মনে একশো একটা কথা কয়ে চলে নাসিমার সঙ্গে। তারপর ওদিকের গোল বাকটার কাছে এসে বলে, কিরে তুই যে কথা বলছিস না বড়।

তুই বল। আমি শুনবো বলেই তো তোকে নিয়ে এলাম।

বিনতা স্বচ্ছ একটা হাসি পাঠিয়ে দেয় বাতাসে। নাসিমা বলে, ভাবছি ফুল কিনবো। কতদিন ফুল কিনিনি।

কোল ভরে রজনীগন্ধা কিনে নাসিমা বেরিয়ে আসে। এসে রিকশা নেয়। বিনতা বলে, ফুলের জন্যে তুই চিরকাল পাগল হয়ে রইলি।

নাসিমা বুক ভরে ঘ্রাণ নেয় রজনীগন্ধার। সারাটা শরীর যেন ফেটে পড়তে চায় তার সৌরভে।

তোর হিংসে হয়, বিনতা?

আজ রাতে বিনতা অবসাদে বিভোর ঘুমোবে। নাসিমা আজ অনেক রাত অবধি বিছানায় ছটফট করবে, তারপর ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে কলকাতার বিশাল বুকে।

নাসিমা চুপ করে এইসব ভাবছিল।

বিনতার তখন সাবেকি কথা মনে পড়েছে। বিনতা শুধালো, সেই ছেলেটিকে তোর মনে আছে?

কে? কার কথা?

নাসিমা নিজেই অবাক হয়ে যায় যতটুকু সচকিত হওয়া তার উচিত ছিল এই প্রশ্নে ততটুকু সে হলো না বলে।

আনিসকে ভুলে গেছিস নাকি?

হৃদয়ের যে স্রোতোধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আবার তা বইতে শুরু করল। নাসিমা উত্তর করল, ওহ্‌ আনিস? না, ভুলে যাবো কেন? সাপকে কেউ ভুলে যায় কখনো?

আনিস বিয়ে করেছে।

কাকে?

জানি না।

বউ দেখেছিস? কেমন, রাঙা টুকটুকে?

হয়তো। আমি দেখিনি।

নাসিমা ভাবলো, আনিস মরে গেছে। মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিয়েছে। এই অসংখ্য মৃত্যুর বিয়োগ থেকে জীবনকে আমি কবে শুদ্ধ করে তুলবো? বিনতা বলে চলেছে, মাসখানেক আগে এসেছিল প্রবীরের সঙ্গে। বলে গেল।—-রাগ করলি নাকি? আগে জানলে বলতাম না।

নাসিমা কি অসতর্ক হয়ে পড়েছিল? জোর করে লঘু কণ্ঠে সে বলল, রাগ করবো কেন?

.

খেতে বসার আগে নাসিমা বালতি বালতি পানি ঢেলে এলো গায়ে। বিনতার ফর্সা তোয়ালে দিয়ে গা মাথা মুছলো। খোলা এলোচুল ছড়িয়ে দিল পিঠের ওপর। ভিজে ভিজে। কালো, শীতল। স্নিগ্ধতায় শ্রীমতি হয়ে উঠলো তার মন।

ঠিক তখন প্রবীরের সঙ্গে দেখা। প্রবীর বারান্দার থামে হাত রেখে হেসে বলল, অনেক দিন পরে দেখলাম। কেমন আছেন?

ভালো। আপনি?

ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারি না।

বেশ তো।

নাসিমার ভালো লাগল প্রবীরকে। স্বচ্ছ, বোধগম্য। বলল, বিয়ে করে এবার বউ আনুন।

বউ? আপনাকেও বৌদির রোগে পেল নাকি? ওই ভয়ে তো বাড়ি ছেড়েছি।

তাই নাকি?

রান্নাঘর থেকে বিনতা বলল, নাসিমা একটু গল্প কর তুই। আমার মাছটা হতে যা দেরি।

সুবোধবাবু আবার এই রাতে রেরিয়েছেন রাবড়ি আনতে।

প্রবীর হঠাৎ কুয়াশা গলায় বলল, আপনাকে দেখলাম হঠাৎ। দেখে কেন যেন ভালো লাগল—- কিছু মনে করেন নি তো?

প্রীতিময় হয়ে উঠল নাসিমা।

না, না। মনে করবার কী আছে? আপনি বেশ কথা বলেন।

কতদিন থাকবেন কলকাতায়?

কী জানি।

আসামে থাকতেন, কী হলো সেখানে?

চলে এসেছি। আর যাওয়া হবে না।

বলেই গভীর চোখে তাকাল প্রবীরের দিকে।

প্রবীর থাম থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বলল, বৌদির কাছে চলুন। আমি এসে পড়ে আজ বেচারির রান্না বাড়িয়ে দিয়েছি।

আমিও।

দুপা এগিয়ে, থেমে, পেছন ফিরে তাকাল প্রবীর। নাসিমার শরীরটা শিরশির করে উঠলো।

না প্রবীর, আনিসের কথা তুমি বোলো না।

আনিসের কথা সে বলল না। বলল, কাল রোববার। বেড়াতে যাবেন?

আশ্বস্ত হলো নাসিমা। উত্তর করল, কোথায়?

যেখানে খুশি।—-গঙ্গার পোলের দিকে অনেকদিন যাইনি। যাবেন?

মনে মনে নাসিমা উচ্চারণ করল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, প্রবীর। আমার মমতার উৎস তুমি খুলে দিয়েছ। মুখে বলল, যাবো।

বিনতার ছেলেমেয়েরা এরই মধ্যে এত ভক্ত হয়ে উঠেছে নাসিমার যে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল।

২. হামেদ তখন ঘুমিয়ে ছিল

হামেদ তখন ঘুমিয়ে ছিল। নাসিমা অপলক অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। আমিও কি বিবর্ণ হয়েছি এমনি? ক্ষীণ নিঃশ্বাস পড়ছে হামেদের। পৃথিবীর সঙ্গে জীবনের ক্ষীণ সূত্র। তুমি আমার সহোদর। আমি বেঁচে থাকতে চাই। খাটের পাশে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বসল নাসিমা। আমি বেঁচে থাকতে চাই। মমতায়, প্রীতিতে, সংগ্রামে, সৌন্দর্যে আমি বেঁচে থাকতে চাই। তোমাকে বিশ্বাস করেছি আজ শিশুরাত্রিতে। অসংখ্য আরো মৃত্যুর জন্যে তুমি আমাকে আর প্রস্তুত কোরো না, প্রবীর।

হামেদের কপালে হাত রাখলো নাসিমা।

এসেছিস?

এখন তুমি কেমন আছো?

ওই রকমই। ব্যথাটা বিকেলে আর আসেনি। বোধহয় ভালো হয়ে যাবো। তারপর একটু থেমে হামেদ চোখ বুজে বলল, তোর ভাবীকে আনিয়ে নিবি?

নাসিমা এ প্রশ্নের কোনো উত্তর করলো না। তোমার মৃত্যু শুধু তোমারই। অসুস্থতা কি কেটে যাচ্ছে হামেদের? বদলে নাসিমা বলল, বিনতার সঙ্গে দেখা হলো। আর প্রবীর।

অনেকদিন দেখিনি ওদের। এলো না?

আসবে।

তুই তাহলে কলকাতায়ই থাকবি?

কলকাতা থেকে চলে গেলে আমি দম আটকে মরে যাবো। নাসিমা অস্পষ্ট হাসতে হাসতে বলল, বড় ভালো লাগল কলকাতা। আমি এখানেই থাকব। আর মনে মনে সে বলল, আমাকে বাঁচতে দাও। আজ আমি বহু দিন পরে নরক মুক্ত হয়েছি। প্রীতির আবিরে আমি এখন আচ্ছন্ন।

বিশাল কলকাতা উদার একটা মানুষ। তার উদ্দেশে নাসিমা সমস্ত রজনীগন্ধা সমর্পণ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

.

বুধবার বিকেলে কলকাতায় বৃষ্টি নামলো। তখন নাসিমা আর প্রবীর চৌরঙ্গির এক রেস্তোরাঁয় বসে। আস্তে আস্তে চুপ হয়ে গেল চারদিক, কেবল বেঁচে রইলো বৃষ্টির শব্দ। প্রবীর টেবিলের ওপর দুকনুই রেখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর নাসিমার বাঁ হাতের করতলে রাখা কপোল, ডান হাত অন্যমনস্ক খেলা করছে প্রবীরের দেশলাই নিয়ে। নাসিমা দেশলাইটা দূরে সিগারেট প্যাকেটের ওপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আমি

আমার মত করে বাঁচতে পাবো না, এইটেই বোধহয় পৃথিবীর সবচে বড় দুঃখের, তাই না?

প্রবীর কোনো কথা বলল না।

আমি কার কাছে কী এমন অপরাধ করেছিলাম যে আমাকে এমনি করে কষ্ট পেতে হবে?

কেন আপনার এত কষ্ট?

কেন?

ছায়া ছায়া হাসলো নাসিমা। যেন বিষাদ বৃষ্টি হলো। বলল, একেক জন বুঝি এমনি কষ্ট পাবার অসীম ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। বিনতার গান গাইবার মত হয়ত আমারও এ কষ্ট পাবার প্রতিভা। নইলে এমন হয় কেন?

নাসিমাকে আজ যেন পেয়ে বসেছে। বাইরের অবিবল বৃষ্টি ধারার মত তার মনের দুয়ার খুলে গেছে।

প্রবীর আস্তে আস্তে আঙ্গুল স্পর্শ করে নাসিমার।

নাসিমা তার স্পর্শ সরিয়ে দেয় না। হয়ত তার বাইরের ইন্দ্রিয়গুলো এমন স্তব্ধ হয়ে গেছে যে সে বুঝতে পারেনি প্রবীর কখন তাকে স্পর্শ করেছে। প্রবীর কি নাসিমার ভেতরে এই স্পর্শ দিয়ে সঞ্চারিত করে দিতে চায় তার আত্মিক শক্তি?

নাসিমা অনেকক্ষণ পরে উত্তর করে, মানুষ এত নীচ হয় কেন বলতে পারেন?

প্রবীর উত্তর দিল না।

—-এত নীচ, এত অসুস্থ কেন মানুষ, বলতে পারেন প্রবীর বাবু?

প্রবীর কোনো কথা বলে না। মাথা নিচু করে নাসিমার আঙ্গুল নিয়ে অস্পষ্ট খেলা করতে থাকে।

নাসিমা এবারে হাত টেনে নেয়। বলে, জানি এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না, জিজ্ঞেস করে শুধু শুধু আপনাকে বিব্রত করলাম।

আমি আপনার প্রশ্নটাই ভাবছিলাম। আসলে আমরা হয়ত সবাই খুব স্বার্থপর, নিজের দিকটাকে বড় করে দেখতে গিয়ে অহেতুক আরেকজনকে ছোট করে ফেলি, তাকে কষ্ট দি তার কষ্ট বুঝতে চাই না।

আর অসুস্থতা?

কিসের? শরীরের না মনের?

শরীরের অসুখ অনেক ভালো প্রবীরবাবু। স্বার্থপরতাও কি একটা অসুখ নয়? এ অসুখটা আরেকজনকে শুছু কবরে নিয়ে যায় যে।

প্রবীর কোমল হয়ে ওঠে।

আপনি অনেক আঘাত পেয়েছেন জীবনে। আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। বলবো?

বলুন—-কী কথা?

আমার কী মনে হচ্ছে জানেন, কারো অসুখ তবে আমরা ঘৃণা করি না ওষুধ দিয়ে তাকে সারিয়ে তুলি। মনের অসুখ হলে কেন তাকে ঘৃণা করবো তাহলে?

আমি তো কাউকে ঘৃণা কবিনি, প্রবীরবাবু।

এই উত্তরটা মুখে দিলেও, মনে মনে নাসিমা প্রবীরের কথাটা নিয়ে বিশদ ভাবতে থাকে। প্রবীর বলে চলেছে, আমি জানি, আপনার মত মানুষ কাউকে ঘৃণা করতে পারে না। মনের অসুখটাকে কি আমরা সবাই মিলে সারিয়ে তুলতে পারিনে? মনের অসুখটাও তো সাময়িক। একটা মুহূর্তের বিকার মাত্র?

হয়তো। কিন্তু এ অসুখটা যার হয় সে অসুখটাকে ভালোবাসে বলেই হয়।

নাসিমা এতক্ষণে প্রবীরের গোড়ার প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পায়।

আপনি বলছিলেন না, মনের অসুখ হলে তবে ঘৃণা করব কেন? প্রবীরবাবু, আপনি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন?

না।

ভালোবাসেন নি?

নাসিমা আবার প্রশ্ন করে। করেই প্রবীরের চোখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে, —-ভালোবাসার দরকার হয় না, এমনিতেই বুঝতে পারা যায় মনের অসুখ আর শরীরের অসুখ এক নয়, প্রবীরবাবু।

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর কখন ভাবনায় রূপান্তরিত হয়ে যায় তার। শরীরের এমন একটা নিয়ম আছে ওষুধ তাকে মানতেই হবে, যদি জীবনীশক্তি ব্যয়িত হতে হতে তার শেষ লগ্নে তখনো পৌঁছে থাকে। কিন্তু মন? মনের ভেতরে চলেছে নিয়ত নিয়মের এক দ্বিমুখী সংগ্রাম। সেখান থেকে কি মুক্তি আছে কারো? আমার মনের যে শুদ্ধ নিয়ম তাকে দিয়ে সৃষ্টি করি বাইরের পৃথিবীকে, আর আরেক দিকে বাইরের পৃথিবী তার নিয়ম দিয়ে শাসন

করতে চায় আমাকে। বার থেকে এমন কোনো শক্তি নেই মনের অসুখ সারিয়ে তোলে। আত্মাকে দৃঢ় করতে পারলে আর ভয় নেই। এই দ্বিমুখী সংগ্রামের শেষ হবে কবে? কবে আমি পারবো থুতু আর কাদাকে ভয় নয়, উপেক্ষা করতে, প্রবীর?

অনেকক্ষণ কথা বলেনি নাসিমা। হঠাৎ সেটা লক্ষ্য করে সে বলল, সহজ, শাদা একটা মানুষ আজ অবধি আমার চোখে পড়ল না।

আমরা সবাই কত একা।

প্রবীর তাকাল তার চোখের দিকে।

বাইরে বৃষ্টি ধরে গেছে। আর কোনো শব্দ নেই বৃষ্টিপতনের।

প্রবীর বলল, আরো বসবেন, না বেরুবেন?

চলুন বেরোই। বৃষ্টির পরে শহর খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, না?

নাসিমা উঠবার আগেই দাঁড়িয়ে পড়ল প্রবীর। উঠতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। মনে হলো, প্রবীর অদৃশ্য হয়ে গেছে, বদলে সিল্কের একটা হাওয়াই শার্ট আর চকোলেট উলেন ট্রাউজার ঝুলছে তার সমুখে।

.

আরজুর আয়নাটা নগ্ন, নিষ্ঠুর।

নেয়ে আসবার পর আসল চেহারাটা যেন বেরিয়ে এসেছে শ্যাওলা ছাড়ানো পৈঠার মত। কানের দুপাশ দিয়ে লতিয়ে নেমেছে চুলের গুচ্ছ, হয়ত সেখানে খুঁজলে একটা দুটো শাদা চোখে পড়বে। আমি পুরনো হয়ে যাচ্ছি। এই পুরনো হয়ে যাওয়াটা বড় অদ্ভুত; মনে হয়, অনেক দূরে সরে গেছি পৃথিবী, পৃথিবী ছাড়িয়ে যা কিছু সমস্ত থেকে।

বত্রিশ বছরের পুরনো মুখটাকে আয়নায় নাসিমা দেখতে থাকে।

কালো—-হ্যাঁ, কালো বই কি—- কালো ছিল বলে ছোট বেলায় মা–র আফশোসের অন্ত ছিল না। বিকেল বেলায় কোলের কা; বসিয়ে, আজো মনে আছে নাসিমার, দুধের সর দিয়ে মেজে দিতেন তার মুখ। মসৃণ হয়েছে, কমনীয়তা এসেছে, কিন্তু রঙ কাটে নি। অত শত বুঝতো না নাসিমা। মায়ের দুঃখটা আবছা করে মনে থাকতো শুধু। তারপর যখন শাড়িতে সে শ্রীমতি হয়ে উঠলো তখন অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার মুখশ্রী। নিজের বর্ণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকাটা কোনদিন তার স্বভাব ছিল না। সামান্য একটু প্রসাধন, একটু সাবান–তোয়ালে তা–ই যথেষ্ট। আনিস বলত, তোমার মুখ আকাশের মত।

কৈশোর পেরুনো সেই প্রথম বয়সটাই অদ্ভুত একটা অহংকার সঞ্চারিত করে দিত যেন এই প্রশংসাটুকু। করাচির সেই দুকামরার ফ্ল্যাটে ডাক্তারের ওখান থেকে ফিরে আসবার পর তার এই কথাটা অনেকক্ষণ ধরে মনে পড়েছিল। জওয়াদ ট্যাকসির ভাড়া দিয়ে ওপরে ওঠে এলে পর তার মনে হয়েছিল প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে কেউ যদি আজ গান গেয়ে উঠে তবু এই দূরত্ব ভরে উঠবে না। এত দূর এত দূরত্ব আমার। কে যেন বলেছিল আমার মুখ আকাশের মত। বাইরের রঙটাই শুধু নয়, আমার মনও যে তেমনি সুদূর হয়ে গেছে, আনিস কি তা বুঝতে পেরেছিল? না কি জওয়াদও বুঝতে পারে এ কথা? আমি যে আকাশের মত দূর থেকে প্রীতিতে নত হয়ে তোমাদের মিছিল দেখে চলেছি আজীবন দিনগুলি।

আকাশের মত নাসিমার মুখ।

আজ সে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে বার থেকে। ফ্যাকাশে ছাই ছাই একটা আভা এসেছে। গালের হাড় স্পষ্ট হয়ে ওঠায় দুচোখের তীক্ষ্ণতা যেন বেড়ে গেছে, আর রেখা রেখা জ্যামিতিক চেহারায় ওই বৃত্ত দুটো যেন বিদ্রোহ করে আছে সারাক্ষণ। সারাটা মুখে কোনো সঙ্গতি নেই। একেই কি বলে বীভৎসতা? বত্রিশ বছরের ফসিল এই মুখ এতকাল পৃথিবীর কোন গোপনে লুকোনো ছিল, অনেক নাসিমার মৃত্যুর পর সে তার সময় বুঝে বেরিয়ে এসেছে বিবর থেকে।

মতির মা–র কণ্ঠস্বরে হাতটা কেঁপে গেল গলায়। পাটা ডিবেয় রাখতে রাখতে সে উঠে দাঁড়াল।

আজ আবার সে আরজুর শাদা শাড়িটা পরেছে। যেন অদৃশ্য রূপোর রেকাবি থেকে উত্থিত গাঢ় ধুপরেখা বাতাসে স্থির হয়ে আছে।

মুখ ফেরাতে গিয়ে কেমন সংকোচ হলো নাসিমার। মতির মা তার এই বারবার নাওয়াটাকে মোটেই যে ভালো চোখে দেখতে পারছে না, এ সে প্রথম দিনেই বুঝে নিয়েছে তার হাসি থেকে। এখন যেন হঠাৎ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে নাসিমা।

কিন্তু আজ আমাকে স্নিগ্ধ রাখতে হবে আমার মন। আরজুর বারান্দার শাদা শাদা ফুলের মত, কলকাতার ফুটপাতে কেনা রজনীগন্ধার টিউবের মত।

নাসিমা ঘুরে দাঁড়াল।

না, এখন আমি চা খাবো না। পরে দিবি।

উনুনে পানি দিয়েছি যে।

তোর কি আর কোনো কাজ নেই, মতির মা? আরজু বলে গেছে বলে আমাকে নিয়ে এমনি করে পড়তে হয়? পানি ফেলে দেগে যা, চাচাস নে।

চাঁচালাম কই আপামনি, জিজ্ঞেস করছিলাম শুধু।

তারপর একটু থেমে, —-ওই সাহেব আসবার কথা আছে বুঝি?

নারী হলেই কি অনুভূতি এত প্রবল হতে হয়?

সেদিন মতির মা–কে দিয়ে ফুল পাড়ানোর কুফল ভুগতে হচ্ছে নাসিমাকে, শুনতে হচ্ছে ইঙ্গিত, দেখতে হচ্ছে চাপা হাসির বিচ্ছুরণ। মনে হলো ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দেয় মতির মা–র গালে।

আর একটু পরে বেবি আসবে তার উজ্জ্বল দুই চোখ নিয়ে। তার মসৃণ করে কামানো তরুণ গালে সন্ধ্যের আলো এমন একটা নীল আভার সৃষ্টি করবে যে বারবার ইচ্ছে করবে সেখানে আলতো করে একটা চুমো দিতে।

বেবি আসবে। আমার জন্যে সে আসবে। বেবি আসবে। বেবি এক্ষুণি আসবে।

রাতে প্লেন এলো ঢাকা বিমানবন্দরে।

জানালা দিয়ে অনেক আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল বিন্দু বিন্দু আলো—-নিচে, অন্ধকার শহরে। বব জানালা থেকে ক্লান্ত চোখ ফিরিয়ে শুধালো, ইজ দ্যাট ডাউন দেয়ার হোয়ার উই গো? ইয়েস, ডার্লিং।

সংকেত।

নাসিমা ববের সিট বেল্ট লাগিয়ে দিল। তারপর নিজেরটা। ববের মাথা ব্রাশ করে দিল খানিক আঙুল দিয়ে। বব বলল, আই স্লেপট লং।

ইউ ডিড।

হ্যাভ আই মিস্ড এ্যানি ফান?

নাসিমার হৃদস্পন্দন মুহূর্তের জন্যে দ্রুত হয়ে আবার স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। আমি মনে করেছিলাম, তুমি মরে গেছ, বব। আমি বোধহয় চিৎকার করে উঠেছিলাম। সবাই মুখ টিপে হাসছিল অনেকক্ষণ। শুনে তুমিও কি হেসে উঠবে, বব? না, কোনদিন তুমি জানবে না।

নো ডিয়ার, ইউ হ্যাভ মিস্ড এ্যানিথিং—-দেয়ার ওয়াজ ক্লাউড অ্যান্ড সান অ্যাণ্ড ক্লাউড এগেন অ্যাণ্ড ইউ কুড সি ডাউন বিলো—-রিয়ালি দেয়ার ওয়াজ নো ফান।

মাটির স্পর্শ শিহরণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা প্লেনে। দৌড়তে থাকে রানওয়ে দিয়ে। দুদিকে পাল্লা দিয়ে যেন অন্ধকার আর গাছ ছুটে চলেছে। আর বাতাস যেন বদলে গেছে হঠাৎ। নাসিমার মন তখন বিষ হয়ে আসছে। যে উত্তেজনা নিয়ে করাচি ফেলে এসেছিল

সে কখন যে সেটা অন্তর্হিত হয়েছে তা বুঝতে পারেনি। আবার তাকে আবিষ্কার করে নিতে হবে দ্বীপ। আবার কি তাকে পালাতে হবে?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ববকে হারিয়ে ফেলল নাসিমা।

চারদিকে আকুল হয়ে খুঁজেও ববকে যখন পেল না তখন মনে হলো একটা শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে তার শরীর থেকে। মৃত্যুর শীতলতা সে অনুভব করতে পারলো হৃদপিণ্ডে।

কাস্টমসের পাল্লা চুকিয়ে হলে এসে দাঁড়াতে চোখে পড়ল ববকে। বব হৈহৈ শুরু করে দিয়েছে এরি মধ্যে ছোট ছোট তিনটে ছেলেমেয়ের সঙ্গে। ওর বাবা, নতুন মা দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। হাসছে।

পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো নাসিমা।

বব যেন আমাকে দেখতে না পায়।

.

বৃষ্টির পরে সারা কলকাতা নতুন একটা পয়সার মত ঝকঝক করছে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা সন্ধ্যেটাকে আবাহন জানাল। মনে মনে। তারপর কার্জন

পার্কে গিয়ে। পাশাপাশি বসলো দুজন। এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেনি, বলল না। নাসিমা এতটা অন্তরঙ্গ বোধ করছে আজ প্রবীরের সঙ্গে যে শব্দের আদান-প্রদানটাই বাহুল্য মনে হচ্ছে তার কাছে। প্রবীরকে বিশ্বাস করেছে সে, এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে? আমার শরীরে আজ কোনো জ্বালা নেই, আমি হয়ত আজ ঘুমোতে পারব ঘুমের ওষুধ ছাড়াই।

প্রবীর বসে বসে সিগারেট টানছে। আলোয় ধিকিধিকি জ্বলে উঠছে তার চোখ। কখনো কখনো মাথা ফিরিয়ে দেখছে নাসিমাকে, তারপর আবার দূরে দূরে মানুষ, মানুষের ওপরে আকাশকে। নাসিমা মনে মনে বলল, আমি তোমাকে আজ বৃষ্টির মুহূর্তে চৌরঙ্গির রেস্তোরাঁয় সৃষ্টি করেছি।

বাসায় পৌঁছে দিল প্রবীর। তখন অনেক রাত। প্রবীর বলল, আজ ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না, কী করি বলুন তো।

আমি কি ফিরিয়ে দিচ্ছি আপনাকে?

আহা তা কেন? বসবো কিছুক্ষণ? একটু চা খাওয়াবেন?

খাবেন? আসুন।

বলতে বলতে দুজনে গিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকলো। বাতিটা জ্বেলে দিতেই অন্ধকারে–বিশাল কামরাটা ছোট হয়ে এতটুকু হয়ে গেল যেন।

প্রবীর সোফায় বসে টিপয়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ক্লান্তিতে আড়মোড়া ভাঙ্গল। পরে বলল, অনেকক্ষণ পরে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পেয়ে যেন মুক্তি পেলাম।

কৌতুক–অভিযোগে স্বচ্ছ হয়ে এলো নাসিমা।

এতক্ষণ তাহলে শুধু শুধু আমার জন্যে কষ্ট পেয়েছেন বলুন।

কষ্ট? তা পেলামই বা। এই কিছুক্ষণ আগে ছেলেমানুষের মত একটা প্রতিজ্ঞাও করে ফেলেছিলাম মনে মনে।

কী রকম?

আপনার জন্যে মনে হচ্ছিল আমি যে কোনো কষ্ট করতে পারি।

তাই নাকি?

যেন কিছুটা অভিমান ভরা কণ্ঠে প্রবীর বলল, ঠাট্টা মনে করলেন?

প্রবীরের এই অভিমানটুকু মধুর লাগল নাসিমার। প্রবীর নিচু হয়ে সিগারেট ধরালো আরেকটা। নাসিমা বলল, চা খাবেন বলছিলেন? আপনার চা করে আনি।

অনেকক্ষণ পরে খালি হাতে ফিরে এলো নাসিমা। বলল, কপাল মন্দ আপনার, অতিথিকে যত্ন করতে পারলাম না। চা পাতা নেই ঘরে। কী করবেন?

থাক, না হলেও চলবে।

তাহলে বসুন আরো কিছুক্ষণ।

আসলে নাসিমার ফিরতে দেরি দেখে প্রবীর উঠে ঘরময় পায়চারি করছিল। নাসিমা তার মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বসলো অবশেষে।

বসবেন না? দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

বসে থেকে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গিয়েছিল। হাঁটছি খানিকটা।

দাদাকে দেখে এলাম, ওখানে দেরি হয়ে গেল।

কেমন আছেন উনি?

ওই রকমই। একটু বেড়েছে মনে হলো।

ব্যথা?

হ্যাঁ। ডাক্তার সন্ধ্যেয় ইঞ্জেকশান দিয়ে গেছে শুনলাম। এখন ঘুমোচ্ছে।

রাত বেশ হলো, না? আজ সারাটা দিন কাটালাম আমরা। বলতে বলতে প্রবীর এসে বসলো তার সমুখে। বলল, কথা বলুন। কিছু বলুন।

কী বলব?

আপনার কথা। আপনার সব কথা আমাকে বলুন, আমি শুনবো।

কষ্ট পেতে চান?

প্রবীর অস্পষ্টভাবে নাসিমার হাতে হাত রাখলো।

চাই।

হামেদকে যখন দেখতে গেলাম, নাসিমা ভাবল, তখন সে কত অসহায় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। প্রবীরের চোখের দিকে তাকাতে পারল না নাসিমা। হঠাৎ নিজেকে বড় অসহায় মনে

হলো তার। দুর্বল একটা হাসি ছড়িয়ে ভাঙ্গা গলায় বলল, তারচে গল্প শুনুন, কিসের গল্প বলবো? প্রবীর কোনো কথা বলল না। স্পর্শ সরিয়ে নিল না।

—-আমি তখন খুব ছোট। আমার মনে আছে একদিন খুব বড় বড় শিলাবৃষ্টি হলো। ছোটবেলার গল্প শুনতে আপনার ভালো লাগে? আমাদের দেশের বাড়িতে সবকটা ঘরই টিনের।

প্রবীর এবার তার মনিবন্ধে তার রাখলো।

নাসিমার কণ্ঠ হঠাৎ দ্রুত দুর্বল হয়ে এলো—-টিনের ছাদে কখনো শিল পড়ার আওয়াজ শুনেছেন? শোনেননি? ইংরেজি রেকর্ডের সোলা ড্রাম পিসের মত আরো জোরে আরো তীব্র। বীভৎস, বুক স্তব্ধ করা।

প্রবীরের হাত কী উষ্ণ। কাঁপছে, প্রবীর তোমার হাত কাঁপছে।

ভয়ে নাসিমা উঠে দাঁড়াল, যেন কেউ তাকে জোর করে উঠিয়ে দিল আসন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল প্রবীর পাহাড়ের ঢালে গড়ানো একটা পাথরের মত। নাসিমা বন্ধ করতে পারল না তার কথা। যেন এ সমস্ত কথা সে নিজে উচ্চারণ করছে না; অন্য কেউ তার ভেতর থেকে করছে, তার কোনো হাত নেই।

—-এত ভয় পেয়েছিলাম সেদিন—-নাসিমা হাসতে চেষ্টা করল—-যে খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়েছিলাম।

প্রবীর, তোমার চোখে আগুন।

প্রবীর তাকে দুহাতে বুকের পাথরে পিষে ফেলল।

না—-না—-প্রবীর।

কিন্তু আমি কেন স্তব্ধ হতে পারছি না? আমি কেন বলে চলেছি—-বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও বেরোইনি। এত ভয়।

প্রবীর ঠোঁট দিয়ে খুঁজলো তার ঠোঁট। আমি ঠোঁট সরিয়ে নেব, আমাকে কথা বলতে হবে। কথা—-কথা।

—-শেষে আব্বা আমাকে জোর করে টেনে বের করেছিলেন খাটের তলা থেকে। বলেছিলেন

প্রবীর তার বাঁ হাত দিয়ে ব্লাউজের মুক্তি খুঁজছে।

নাসিমা চিৎকার করে উঠলো এই প্রথম —- প্রবীর।

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। প্রবীরের মুখ অবাস্তব হয়ে উঠেছে। তাকে চিনতে পারলো না নাসিমা। আমি তোমাকে কোনদিন দেখিনি।

যান, চলে যান আপনি। আমার জন্যে কাউকে আর কষ্ট পেতে হবে না।

মিথ্যে, শুধু মিথ্যে।

পালাও, নাসিমা, পালাও।

এই স্তব্ধতা কি এক মৃত্যু থেকে আরেক জন্মের মধ্য-শূন্যতা?

নাসিমা অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল। তবু যেন কণামাত্র মুছে ফেলতে পারল না প্রবীরের স্পর্শ।

.

চারদিন পরে হামেদ মারা গেল তার ঘুমে। তার মৃত্যু যে একটা মুক্তি এনে দিল নাসিমাকে। একমুহূর্তে সমস্ত ক্ষোভ আর ক্লেদ মুছে গেল আত্মা থেকে। আমার অনুতাপ নেই, প্রতীক্ষা নেই, আমি নির্মল একা। গোরস্তান থেকে ফিরে এসে হামেদের শূন্য

বিছানায় বসলো সে। একটা মানুষ মরে গেলে তার কামরা সহসা এত বিশাল হয়ে যায় কেন?

শূন্যতা কেন স্পন্দিত হয়ে উঠতে চায় বারবার?

সেই বিশালতায় দাঁড়িয়ে নাসিমা মনে মনে উচ্চারণ করল, আমি তোমাকে করুণা করি, প্রবীর। এবারে আমি চলে যেতে পারি।

.

বেবি যখন এলো তখন ছটা বেজেছে। আর আকাশের পশ্চিমে নিবিড় একটা অন্ধকার ভায়োলেট হয়ে নেবে আসছে আস্তে আস্তে। তার পদপাত অনেকটা বেবির মত। প্রায় বোঝ। যায় না, কিন্তু অস্থির, একমুখী।

বেবি এসে বলল, দেরি করে ফেলোম। অনেকক্ষণ বসেছিলে?

ছিলাম। দেরি হলো কেন? তোমার জন্যে এখন অবধি চা খাইনি আমি।

বেবি একটু অপ্রতিভ হলো।

আর দেরি করবো না।

কোরো না। কক্ষনো কোরো না। কেউ বসে থাকলে তার কষ্ট হয় না?

হঠাৎ নাসিমা হেসে ফেলে—-ইস, আজ তোমাকে খুব করে বকতে ইচ্ছে করছে।

কেন?

কেন আবার? মানুষ বকে কেন? দোষ পেলেই বকে।

বেবি বাতাসের কাঁপনের মত মৃদু মৃদু হাসে। তার যেন কোনো সত্যি সত্যি ভয় নেই নাসিমার কাছ থেকে এখন, এই কথাটা বুঝতে পেরে দুহাতের তালু বাজাতে থাকে অস্পষ্ট করে। নাসিমা বলে, মতির মা চা নিয়ে আসুক, কেমন? না কি ঘরে খাবে?

ঘরের প্রসঙ্গে উঠতেই বেবির আগ্রহ যেন বিবর্ণ হয়ে যায়—-কেননা, বেবি যে আরজুর। স্বামীর ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে, এই কথাটা মনে পড়ে গেছে হঠাৎ। কী একটা অপরাধবোধ সচকিত হয়ে ওঠে ভাবনায়। বলে, না, বারান্দাতেই ভালো। কী বলে?

যা বলো তুমি।

মতির মা চা আর নাশতা এনে রাখলো। নাসিমা ফেরার পথে কিছু শাদা সুগন্ধ ফুল মুঠো করে এনে বেবির হাতে দিল।

পকেটে রেখো। বাসায় ফিরে আমার কথা মনে পড়বে।

বেবি বলে নাকের কাছে ছুঁইয়ে, বেশ ঘ্রাণ। বলতে বলতে ওপর পকেটে রেখে দেয়। যোগ করে, আমার টেবিলে রাখবো।

তারপর দুজনে মুখোমুখি বসে চা খেতে থাকে।

চা খেয়ে বেরোয়।

প্রীতিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে আসে নাসিমার। এতক্ষণ ধরে আরজুর আয়নার নগ্নতা আর শরীরের নামহীন সেই অস্বস্তিটা তাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছিল। বাইরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তার আর চিহ্নমাত্র রইলো না।

রিকশার দোলায় বেবির শরীর ছুঁই ছুঁই হয় নাসিমার সঙ্গে। বেবি সঙ্কুচিত হয়ে এতটুকু হয়ে যায় যেন। মধুর লাগে নাসিমার। মুখে বলে, এত লাজুক তুমি!

কই না?

বদলে বেবি আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, রক্তিমাভা ছড়ায় সারা মুখে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না। কিন্তু নাসিমা জানে ওর মুখ এখন করতলের মত বক্তিম হয়ে উঠেছে। আরো একবার তার নাম ধরে ডাকে নাসিমা, বেবি, বেবি।

প্রায় ফিসফিস তার কণ্ঠস্বর।

কী, বলো না? বলবে কিছু?

না, এমনি।

বেবি আবার হাসলো। তেমনি কাঁপন তোলা ওর পুরনো মৃদু মৃদু হাসি। এক মুহূর্তের জন্যে নাসিমার ভালো লেগেছিল তার নাম ধরে ডাকতে নাম উচ্চারণের ভেতর দিয়ে এই নাম যার তাকে নিশ্চয় করে অনুভব করতে। হঠাৎ এক ঝলক তীব্রতার মতো নাসিমার মনে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে গেল একটা অন্ধকার যে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আকাশের অনেক শূন্যতা থেকে কে যেন বলেছিল, ইজ দ্যাট ডাউন দেয়ার হোয়ার উই গো?

ইয়েস, ইয়েস।

মনের ভাবনাটা কখন অস্পষ্ট উচ্চারণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। বেবি উন্মুখ হয়ে তাকাল তার দিকে। বলল, কী?

এই অতল অন্ধকারে কি আমার যাত্রার শেষবিন্দু? না, আমি তো কিছু বলিনি। ইয়েস, ইয়েস। বেবি, আমি কিছু বলিনি তোমাকে কিছুই বলিনি।

তবু কেন এমন হবে আমার কণ্ঠের ওপর থাকবে না আমার কোনো শাসন? কেন আমার ভাবনাগুলো আপনা থেকেই বেছে নেবে বাইরে বেরুবার শরীর? উচ্চারিত হবে?

নাসিমা এইসব ভাবলো বেবির ছোট্ট প্রশ্নের পর। ব্রিত, ক্ষুদ্র বোধ করল নিজেকে। বলল, ঢাকায় এই প্রথম এলাম আমি।

জানি।

তোমাকে নিয়ে বেরুলাম শহরটা চিনবো বলে—- আর তুমি কিনা চুপ করে রইলে?

কই?

কথা বলো। এত অন্ধকার কেন, বেবি? আলো নেই, মানুষ নেই, একী রকম শহর?

এত বিনষ্ট মনে হলো শহরটাকে নাসিমার, রিকশা থেকে বাইরে দৃষ্টি করে বুকের ভেতর সে একটা দম আটকানো ব্যথা অনুভব করল। কেমন বিচ্ছিন্ন, উদ্বেগহীন, কম্পিত এই শহর। একটা কালির ফোঁটাকে মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখলে যেমন—-ইজ দ্যাট

ডাউন দেয়ার? ওখানে? ওখানেই কি? আমি জানি না, নাসিমা ভাবলো; নাসিমা আরো ভাবলো, অথচ এখানেই।

বেবি বলল, এই পথটা আগে এত সরু ছিল! এখন যা দেখছ ঠিক তার আদ্ধেক। আর দুধারে পঞ্চাশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলা সব দোকান। উনিশ শপঞ্চাশের পর এইসব হয়েছে। আরো হবে।

তাই নাকি?

শহরটা বাড়ছে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ছে যে, সাতদিন আগে কোথায় কী ছিল মনে রাখা যায় না। এখানে, হ্যাঁ এখানেই হবে, সেই গাছটা ছিল—-একটা সিগারেটের দোকান, ওইখানে মাঠ আর ওধারে বোধহয় সিনেমা হলটা। কী জানি, ঠিক মনে পড়ছে না।

নাসিমা চোখ বুজঁলো। ভাবনাগুলো চোখের পাতার মতো নিঃশব্দে নেবে এলো। আমিও আর কিছু মনে রাখতে চাই না। কোনো স্মৃতি. কোনো সঞ্চয়, কিছু না। শুধু আমার শরীরে দাগ দেখে কেউ হয়ত কোনদিন মনে করতে চেষ্টা করবে– না!

আবার ফিরে এলো। আনিস, জওয়াদ, লাবু চা বাগান। ওরা কারা? হামেদ আমাকে বিশাল করে দিয়ে গেছে।

আনিস বলেছিল, আকাশের মত আমার মুখ। আমি কি অপূর্ণ থাকব? করাচির অপারেশন টেবিলে কি আমার শেষ মৃত্যু হয়ে গেছে? বেবি পাশে বসে উসখুস করেছিল, সেটা হঠাৎ চোখে পড়ল নাসিমার।

কিছু বলবে?

কোথায় যাবে তাই শুধোচ্ছিলাম।

কোথাও না। এমনি।

মনে মনে বলল, আমার নতুন জন্ম, নতুন শহর। তুমি আমার আনন্দ, তুমি আমার সুন্দর। মুখে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল, চল, এখানেই নেবে পড়ি। হাঁটব আজকে।

রিকশা থেকে নেবে বেবি পয়সা দিতে গেল কিন্তু নাসিমার জন্য সম্ভব হলো না। খুচরো পয়সা ফিরিয়ে নিতে নিতে তরলকণ্ঠে বলল, খুব বড়লোক হয়েছ, না? বাড়ি থেকে বুঝি পাঁচশ টাকা করে অ্যালাউন্স দিচ্ছে?

তবে কী!

বেবিও কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরে যোগ করে, বাঁচালে আমাকে।

বাসা থেকে বেরুবার সময় অনেক খুঁজে-পেতে বেবি পনেরো টাকা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল।

নাসিমা আচমকা প্রশ্ন করে, তুমি সিগারেট খাও, না?

কেন? মানে খাই তো।

ডেঁপো কোথাকার। আমার সমুখে বলতে লজ্জাও করলো না? আছে? না, কিনতে হবে? না থাকলে কিনে নাও।

বলতে বলতে নাসিমা ব্যাগ থেকে টাকা বার করলো।

.

বেবির সিগারেট ধরানো অনভ্যস্ত ভঙ্গিটি লক্ষ্য করে নাসিমা না হেসে পারলো না। বেবি ফস করে ঠোঁট থেকে সিগারেট নাবিয়ে শুধালো, হাসলে যে?

কদ্দিন হলো সিগারেট খাচ্ছো শুনি?

কেন?

শুধোচ্ছি।

বেবি তখন ভারী লজ্জা পেয়ে গেল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দূরে সাইন আলোর দিকে। তাকিয়ে উত্তর করল, আগে খেতাম না। এই ইউনিভার্সিটিতে উঠে।

তাই বলো।

নাসিমার কণ্ঠের স্বচ্ছতা বেবিকে এমন করে স্পর্শ করে যে তখন তার মনে হয় সে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে। নিজেকে জোর করে দুপায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখবার চেষ্টাটা কেমন ব্যর্থ হয়ে যেতে থাকে। এমন কি খুব অস্পষ্ট করে একটা অভিমান গড়ে উঠতে থাকে তার বুকের ভেতরে। কিন্তু নাসিমার পরের কথা তার শ্রুতিতে এসে কাঁপন তোলার সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার প্রসন্ন হয়ে যায়।

নাসিমা বলছে, রাগ করলে নাকি?

না—-না।

ওরা তখন হাঁটতে থাকে রমনা পোস্টাফিসের সমুখ দিয়ে। কেমন আঁধার আঁধার, আর তারি ফাঁকে ফাঁকে মানুষ, টাঙ্গাইল যাবার বাস আর টিমটিমে লালচে আলো ফেরিদোকান থেকে। দীর্ঘ বাসগুলো যেন একেকটা অনুভূতির মত স্তব্ধ হয়ে আছে। তাদের হলুদ রঙ মৃতের মত পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। আর গাছ। আর শাদা মসজিদটা শাদা।

নাসিমা বেবির ডান হাত তুলে নেয়। আঙুলে আঙুল ছুঁইয়ে হাঁটতে থাকে। আঙুলের উষ্ণ স্পর্শে নাসিমা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে, সে এই পৃথিবীর কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। আছে, শুধু আছে এই বোধ তার এত প্রয়োজন।

আস্তে আস্তে আলোয় এসে পড়ে ওরা। একটা স্বচ্ছন্দ স্রোতোধারায় অনায়াসে যেন তারা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্ত যে কত পবিত্র তা পৃথিবীর কেউ জানব না। নাসিমার মনে হয় জীবনে সমস্ত থুতু আর কাদার সাম্রাজ্য থেকে তার শুভনির্বাসন ঘটেছে। সে মুক্ত। অনুরাগে তার মন গান হয়ে উঠতে চাইলো।

বাঁদিকের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে স্টেডিয়ামের দিকে মোড় নিল ওরা। এখানটায় এত আলো, এত কণ্ঠ যে নাসিমার মন বিশুদ্ধ রকমে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে, বেবি, রোজ আমি এখানে আসব।

বেশতো। আমিও থাকবো।

থাকবে, থাকবে বৈকি।

সমুখে জুতোর দোকান পড়ল। বেবি দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়াও।

কেন? জুতো কিনবে?

না, এমনি। দেখব। শো কেসে দাঁড়িয়ে জুতো দেখতে তোমার ভালো লাগে না? আমার লাগে।

অদ্ভুত তোমার শখ।

কিন্তু নাসিমাও তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

তোমার কোনটা পছন্দ? এইটে?

দূর—-এত শৌখিন যে মনে হয় গালে বুলোবার জন্যে।

বলেই হেসে ফেলে।

তাহলে ওটা?

হ্যাঁ, ওটা, ওটা ভালো। কিনছ নাকি?

দেখছি।

কিনবে তো চলো না?

বলে নাসিমা একটু আমতা আমতা করে। বেবি, আমাকে তুমি বলতে পারো না? আমার কাছে চাইতে পারো না? একটা ব্যথা অনুভব করে নাসিমা। কেমন বিচ্ছিন্ন অসহায় মনে হয় নিজেকে।

যোগ করে, —-আমার কাছে কিন্তু টাকা আছে।

না, থাক।

তখন নাসিমা দ্বিগুণ মনোযোগ দিয়ে জুতো দেখতে থাকে সাজানো শো কেসে। আস্তে আস্তে তার মনে হতে থাকে কার্নিভালের নাগরদোলার মত জুতোগুলো যেন একটা বৃত্তপথ ধরে ঘুরছে—-উঠছে, নামছে। আবার উঠছে। খুব আস্তে, এত আস্তে যে চোখে দেখা যায় না রক্ত দিয়ে অনুভব করতে হয়। রক্তের ভেতর দোলা অনুভব করে নাসিমা আখতার। স্থির, আরো স্থির। দ্রুত, আরো দ্রুত। হঠাৎ এক সময়ে চাবি ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মত মুহূর্তে তার ভাবনার টানটান সরলরেখা শিথিল হয়ে আসে, ঝুলতে থাকে হাওয়ায় গুড়া শুকনো লতার মত। তখন জন্ম হয় নতুন ছবির। মনে হয়, জুতোগুলো এখন অই শোকেসে সাজানো আছে কারিগরের যন্ত্রে বানানো একটা নৈর্ব্যক্তিক চেহারা নিয়ে, মাপ নিয়ে। তারপর কেউ হয়ত তাকে কিনবে, আস্তে আস্তে তার পায়ের প্রতিরূপ

সৃষ্টি হবে জুতোর শরীরে। তখন আর ঐ চেহারাটা থাকবে না, তখন হবে তার একমাত্র তার পৃথিবীর আর কারো নয়। তখন এই জুতোজোড়াকে আলাদা করে চেনা যাবে না।

কিন্তু কেন আমি ভাবলাম এ কথা? কতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম? বেবি তখনো জুতো দেখছে—-এবারে মেয়েদের শো কেস। নাসিমা তাকে আড়চোখে দেখে নিল পলকে।—-এমনি করেই কি আমরা সবকিছুকে বদলে দিই? আরোপ করি আমাকে? আমার সৃষ্টি তুমি, আর তুমিও, আর এমন কি তুমিও। আমি যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে তুমি হতে। জন্মহীন একটা কুয়াশা মাত্র। আমার রূপ তোমাতে বলেই তুমি বাঁচো।

আমি তোমাকে আমার সুন্দর তৃষ্ণা দিয়ে সৃষ্টি করব, বেবি।

বেবি।

কী?

চলো যাই।

কোথায়?

মনে মনে কষ্ট ছড়িয়ে পড়ল নাসিমার।

আমি প্রশ্ন বুঝতে পারি না। যেখানে খুশি। বলেছি না, আমাকে তুমি শহর দেখাবে।

৩. একটা অন্ধকার পথ পড়ল

কয়েকগজ এগোতেই বামে একটা অন্ধকার পথ পড়ল। দুদিকে উঁচু দালান—- মাঝখান দিয়ে কুয়াশা অন্ধকার একটা খোলা জায়গায় পড়েছে, তার ওপারে আরেকটা পথ বাহুর মত পড়ে আছে। দুদালানের মাঝখানে এসে বেবি বলল, এসো এদিকে। চিপস খাবে? পটেটো চিপস?

খাবো।

নাসিমার মন উন্মুখ হয়ে উঠল বেবির এই আদরটুকু দুহাত ভরে নেবার জন্যে। প্রশ্রয় দেবার আগ্রহে কোমল হয়ে এলো তার চোখ। আবার বলল, তোমার ভালো লাগে, না?

মাঝে মাঝে। এই লোকটা সাইকেল নিয়ে রোজ সন্ধ্যেয় এখানে দাঁড়ায়। সবাই চেনে। শুধু কি পটেটো চিপস? —- আরো কত কী। আমি কখনো কখনো কিনি।

লোকটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে বাঁধা ট্রাঙ্ক থেকে চিপস ভরে ঠোঙ্গা এগিয়ে দেয়। প্রশ্ন করে, অওর দু?

ব্যস, আভি নহি।

বেবি দালানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। মুড়মুড় করে একটা দুটো চিপস দাঁতে কাটতে থাকে। সমুখে দাঁড়িয়ে নাসিমাও।

আরো নেবে?

নাহ্। চলো এগোই।

দূর থেকে চোখে পড়ে আঁধারে আবছা হয়ে আসা স্টেডিয়াম। তার কনস্ট্রাকশনের খাড়া লোহা অজস্র জটিলতা হয়ে আছে আকাশের গায়ে যে আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এখনো। রক্তিম একটা আভা। সব মিলিয়ে খানিকটা মোবাইল স্কাল্পচারের মত লাগে স্টেডিয়ামকে। গভীরে কোথাও কান পাতলে প্রাণস্পন্দন শোনা যাবে যেন।

বেবিকে নিয়ে নালিমা নির্জন স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে এসে দাঁড়াল। সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ওপরে, আরো ওপরে, বাঁধানো চওড়া চত্বরে।

কেউ নেই। এ মাথা থেকে দৃষ্টি করলে সবচে দূরের বিন্দুটি চোখে পড়ে না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা একেবারে ওদিকটায় গিয়ে পড়ল—- ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বিল্ডিংয়ের চুড়োয় লাল তারার কাছাকাছি। দূর থেকে সমস্ত শহরের কোলাহল ঢেউয়ের মত কাঁপন তুলে মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে আছড়ে পড়ছে এই সীমানায়। এত দূরে আমি এসে গেছি। চিরকাল এমনি একটা সুদূরে পৌঁছুনোর চেষ্টা চলছিল বুঝি আমার। পায়ের নিচে

সিমেন্টের রুক্ষ স্পর্শ নাসিমা অনুভব করতে থাকে স্যাণ্ডেল থেকে পদতল নগ্ন করে। আবার তারা হাঁটতে হাঁটতে প্রথম বিন্দুতে এসে পৌঁছোয়।

আস্তে আস্তে শহরটা যেন কাছে চলে আসে। যেন তারা দুজনে স্থির, ঘুরছে তাদের চারপাশে এই দিকের আলো–মানুষ আর ওদিকের আঁধার–নির্জনতা। লাল তারাটা ছোট থেকে বড় হয়ে আবার ছোট হয়ে যায়।

দূর থেকে বেশ দেখায়, না?

কী?

তারাটা।

হ্যাঁ।

আমার হৃদয় এমনি রক্তাক্ত। নাসিমা দূরে সরে যেতে যেতে লাল তারা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। নিচে মাঠের দিকে তাকায়। কয়েককটা লোক স্থির হয়ে বসে আছে। ওপর থেকে দেখাচ্ছে কালো পাথরের টুকরোর মত। আমিও কি ওখানে নেমে গেলে বেবির চোখে অমনি পাথর হয়ে যাবো? কালো পাথর?

দূরে সরে যাওয়ার ফলে বেবির চোখ থেকে নাসিমার মুখ অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু সাদা শাড়ি একটা রঙের পোচের মত আকাশের পটভূমিতে স্থির হয়ে থাকে। বেবির ভালো লাগে এই সাদা রঙটা থেকে এমনি দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে। অদ্ভুত, এমন কী অকারণ একটা কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে তার নাসিমার জন্যে। মনে মনে বলে, আমার কী যে ভালো লাগছে তোমার সঙ্গ পেয়ে তুমি তা জানবে না। আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। আমাকে তুমি নাড়া দাও, ঝড়ের দোলায় অস্থির করে তোলো আমার আর কোনো বাসনা নেই। আমাকে প্রশ্ন করো, লক্ষ লক্ষ অযুত প্রশ্ন।

নাসিমাই প্রশ্ন করল। কী ভাবছিলে?

কই কিছু না।

আমাকে বলতে তোমার ভয় করে?

নাসিমার ইচ্ছে হয় দুহাত দিয়ে ধরে রাখে বেবির সুন্দর এখনো সবুজ মুখ। কোনদিন যেন তাকে হারাতে না হয় এমনি প্রার্থনায় কাঁপতে থাকে তার আত্মা। মমতায় নত হয়ে আসে নাসিমা। বলে, কেউ চুপ করে থাকলে আমার খারাপ লাগে। কেন? তুমি চুপ করে থাকলে আমার আরো খারাপ লাগে।

তখন বেবি ফস্ করে শুধোয়, তোমাকে কী বলে ডাকব?

আজ সন্ধ্যে থেকে এই সমস্যাটা তাকে পীড়িত করছিল।

বেবি গভীর প্রায় অসহায় একজোড়া চোখ মেলে তাকায় তার দিকে। নাসিমার ঠোঁট তখন নিঃশব্দ হাসির কাঁপনে ফুলে ওঠে। নাসিমা হাসে। বলে, ওই পোস্টের কাছে বসিগে চলো। বেবি তখন একটা নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যায়।

নাসিমা তার কাঁধে হাত রেখে বসে।

কাদা তোমাকে স্পর্শ করেনি, তুমি কোনোদিন কাদায় নেবে যেও না।

নাসিমা মনে মনে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করলো বেবির জন্যে।

বেবিকে আমি ভালোবেসেছি, যেমন করে আকাশ ভালোবাসে প্রান্তরের একেলা গাছটিকে। যেমন করে পাখি তার সন্ধ্যেয় ফিরে আসে বাসাতে, তেমনি কি তুমিও ফিরে আসতে পারো না?

নাসিমার নিজেকে মনে হলো একটা শুকিয়ে ম্লান হয়ে যাওয়া বৃক্ষশাখা। বিশ্রাম কেউ নিতে পারে হয়ত, কিন্তু বাসা? বাসা কেউ বাঁধবে না।

নাসিমা বেবির চুলে যখন হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তখন বেবির মন যেন অনর্গল একটা স্রোতধারা হয়ে উঠেছিল।

নাসিমা তার কানে কানে মুখ রেখে বলল, তোমাকে আমার এত আপন, এত ছোট মনে হয়। কথা দাও আমাকে তুমি কষ্ট দেবে না?

বেবি কিছুটা বিস্মিত হলো কিন্তু মুখে বলল না কিছু।

তখন নাসিমা বলল, আমি তোমার মা হতে চাই, বেবি। আমি তোমার মা।

বলতে বলতে উদ্বেগ যেন স্বেদ বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে কাঁপতে লাগল নাসিমার কানের পিঠে, আর চিবুকে, আর কপালের ওপরে। বেবি তখন সমস্ত শরীরটাকে শিথিল করে দিল। কিছু বলল না। নাসিমা তাকে বুকের ভেতরে টেনে অসংলগ্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করল, এখানে, এখানে।

তারপর মাতাল–প্রায় কণ্ঠে বারবার

—-বেবি, বেবি, বেবি। তুমি আমার, বেবি।

যেন নিজের ওপরে আর কোনো কর্তৃত্ব নেই বেবির। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সবকিছু একটা শীতলধারা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হলো পৃথিবীর বাইরে সে চলে গেছে। কোনো কিছু দিয়েই আর সে এই অবস্থার পরিমাপ করতে পারবে না। বদলে, নাসিমা একটা প্রখর শক্তির জন্ম অনুভব করতে পারে নিজের ভেতরে।

.

বিছানার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে পরম একটু স্বস্তি অনুভব করল নাসিমা আখতার। জীবন নয়, মৃত্যু নয়, ক্ষতি নয়—- কিছুই আর নয়। শুধু পূর্ণতা। এই পূর্ণতা কিসের বা কেন তা তার নিজের কাছেই ঠিক বোধগম্য নয়। স্পষ্ট যা তা শুধু তার এই বিশেষ অনুভূতি।

এই পূর্ণতা আমি কতকাল প্রার্থনা করেছি আমার স্বপ্নে আমার জাগরণে কিন্তু কেবলি আঘাত।

মতির মা এসে বলল, অন্ধকারে শুয়ে আছেন, আপামণি, বাতি দেব?

দে।

বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন তাকে কঠিন একটা দৈহিক আঘাত করলো। মুখটা মুহূর্তের জন্যে বিকৃত হয়ে এলো; পরে বলল, কী বলবি বল?

খাবেন না?

খাবার কথা আজ মনেই নেই তার। এমনকি মতির মা মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও সামান্যতম তাগিদও সে অনুভব করতে পারল না।

দৃষ্টি তার নিবন্ধ ছিল ঘরের কোণে রাখা টিপয়ের ওপর একটা উজ্জ্বল পদার্থের দিকে। উঠে বসে শুধালো নাসিমা, ওটা কী?

কোনটা?

কাছে গিয়ে নাসিমার নিজেরই হাসি পেল খুব। জার্মান কাঁচিটা ওখানে পড়ে আছে। আরজু যেভাবে মেয়েকে সাজাতে শুরু করেছে তাতে করে সেলাই কল না কিনে উপায় কী? কিন্তু মেয়েটা এখনো গোছালো হলো না; আগের মতই এলোমেলো। কাঁচিটা কি তুলে রাখতে হয় না?

অন্য কোনদিন হলে নাসিমা ভয় পেত ভীষণ রকমে ওই রূপোলি তীক্ষ্ণতা দেখে। আজ সে শুধু হাত দিয়ে কাঁচিটাকে আলোর সরলরেখা থেকে সরিয়ে রাখলো। পরে মুখ ফিরিয়ে বলল, কই, খেতে দিবি নে?

যেন অপরাধটা মতির মার–ই। কিন্তু মতির মা আজ আটদিন হলো দেখে আসছে নাসিমাকে; তাই এতে সে বিস্মিতও হয় না, বিরক্তও হয় না। শুধু বলে, না বললে দিই কী করে? ভালো কথা আপামণি, সন্ধ্যেয় আপনার জন্যে ফুল তুলে রেখেছি।

কথাটা শেষ করে মুখ টিপে হাসে। মুখটা তার চিকচিক করে ওঠে কৌতুকের তরঙ্গে। নাসিমা যেতে যেতে বলে, তরল কণ্ঠে, তুই মর মতির মা।

.

আজ সে তার শরীরে নতুন করে রক্তপ্রবাহ অনুভব করতে আসছে যেন। আর পৃথিবীর যেখানে যত সংকেত আছে সব কিছু যেন বোধগম্য হয়ে এসেছে। এত নির্ভরযোগ্য মনে। হচ্ছে তার নিজেকে যে, নাসিমা আপন মনে হেসে ফেলল, কেউ যদি আজ তাকে বলত গান গাইতে তাহলে সে অনুরোধ রাখত।

আজ খুব করে খেল নাসিমা। খেয়ে একটা দম আটকানো ক্লান্তি অনুভব করলো। তারপর জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাত অনেক হয়েছে। পথের বাতিগুলো তাই এত উজ্জ্বল। রাস্তার এখানে ওখানে চকচক করছে অ্যাশফট। আর কুকুর। আর একটা ঝড়ের মত মোটর কার।

নাসিমা এসে বসলো আরজুর আয়নার সমুখে।

তুমি আমার সন্তান। তোমাকে কেন্দ্র করে আমি বেঁচে থাকতে চাই অবিশ্বাসের এই পৃথিবীতে।

আয়নার সমুখে বসনেও প্রতিফলনের দিকে দৃষ্টি নেই তার। শুধু শুধু বসা। হঠাৎ বরফ হয়ে গেল যেন সব কিছু।

আজ কি বেস্পতিবারের রাত? নইলে ওই ভিখিবিটা কেন এমনি করে নিশুতি রাতে কান্না করে যাবে পথের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি? গত বেস্পতিবার রাতে, প্রথম যে দিন এসেছিল, অমনি হয়েছিল। এত করুণ, নিষ্ঠুর আর হিম করা তার আর্তনাদ। মতির মা বলেছিল, রোজ বেস্পতিবার রাতে আসে আপামণি।

আজও এসেছে। একটা অর্ধবৃত্তের মত পথ ধরে তার আর্তনাদ শোনালো নাসিমার শ্রুতিতে। নাসিমার মনটা চিৎকার হয়ে উঠতে চায়, হয় সে মরে যাক আর নইলে নিজে সে বধির হয়ে যাক।

হ্যয় কই আল্লাহ্ কা পেয়ারা, নবী কা দুলারা আন্ধা কো দো মুঠি খানা দে–এ–এ।

নাসিমা স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন সে ডাক মিলিয়ে যাবে দূরে। এক সময়ে চলে গেল। কিন্তু নিজেকে আর যেন ফিরে পেল না নাসিমা।

অতলে, আরো অতলে।

কম্পিত দুহাতে আয়নার পর্দাটা সে টেনে দিল তার প্রতিফলনের ওপরে।

.

দরোজার ওপরে দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে আবছা গলায় পারুল বলল, তাহলে তুমি সত্যি চলে যাচ্ছো।

নাসিমা তার খাটের ওপর সুটকেশ তুলে বই কাপড় গোছাচ্ছিল এতক্ষণ ধরে। কখন যে পারুল এসে দাঁড়িয়েছে সে বুঝতে পারে নি। তার কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

পারুলের মুখটা কেমন ছায়া ছায়া হয়ে আছে।

এত কিশোরী তার মুখ যে দেখলে মমতা হয়। এখন সেই মুখ মেঘ ছায়া নিয়েছে। অস্পষ্ট হয়ে এসেছে মুখের রেখাগুলো। পারুল কি কেঁদে এসেছে কোনো নির্জন কোণ থেকে? নাসিমা এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিল। ব্যস্ত হলো তার গোছানোর কাজে। পারুল যদি কাঁদতে চায় তাহলে তাকে কাঁদতে দেয়া ভালো। নাসিমা উত্তর করল, সত্যি করে বলার কী আছে? হা যাচ্ছি।

কিন্তু সহজ হতে পারল না নাসিমা। বিদ্ধ হয়ে রইলো পারুলের এই নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা। পারুল, তুমি চলে যাও।

যে দ্রুততা ছিল তার দুহাতে এখন তা শিথিল হয়ে আসতে লাগল। এক সময়ে সে তাকিয়ে দেখল তার দুহাত স্তব্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। আস্তে আস্তে সমুখের দিকে দৃষ্টি করল নাসিমা।

এই বিন্দু থেকে কামরার তিনটে কোণ চোখে পড়ে। এইতো তার নিজের খাট। সুন্দর করে চাদর বিছানো ছিল—-নিভাঁজ, সাদা, কোমল—- আজ সকাল অবধি। এখন তা ভাঁজ করে তুলে ফেলা হয়েছে। বোর্ডিংয়ের দেয়া পাতলা কাঠ-কাঠ তোষক বিশ্রী একটা শূন্যতার প্রতীক হয়ে পড়ে আছে বদলে।

আর ওই কোণে পারুলের বিছানাটা এখনো পাতা। সুন্দর করে পাতা। পারুল রঙিন চাদর পছন্দ করে। আজ দুপুরে যখন কামরা কেউ ছিল না তখন চুপি চুপি সে পারুলের বিছানাটা শেষবারের মত নিজ হাতে পেতে রেখেছে।

সারাটা কামরায় ছিলাম আমরা দুজন। আজ থেকে আমি থাকব না। শুধু পারুল থাকবে। তারপর হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, অন্য কেউ আসবে। নাসিমার মনে একটা বেদনার দল মেলে উঠতে চাইল। সেও কি তার নিজের মত করে ভালোবাসবে পারুলকে? তার পারুল? চকিতে ঘুরে তাকাল নাসিমা।

পারুল তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দরোজার ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির মত স্তব্ধ তার শরীর। পারুলের কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট হলো নাসিমার।

চোখে চোখ পড়তে পারুল দৃষ্টি নাবিয়ে নিল।

তখন নাসিমা এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলো, থরথর করে কেঁপে উঠলো পারুলের দেহ। নাসিমা কিছু বলল না। স্পর্শের তরঙ্গে তরঙ্গে শক্তি প্রবাহিত করে দিতে চাইল পারুলের আত্মায়। কিন্তু শক্তি নয়, প্রবাহিত হলো বেদনা। পারুলের চোখ থেকে মুক্তো পড়ল ঝরঝর করে।

নাসিমা বলল, তুই কাঁদছিস কেন? আমি কি চিরকাল থাকব? আর আমি থাকলে কষ্ট যে তোর। তোর কষ্ট আমি কী করে দেখব, পারুল? আমি–নাসিমার স্বর তার নিজের কানেই শোনালো রুক্ষ, কর্কশ সেটাকে চাপা দেয়ার জন্যেই কথা বন্ধ করলো নাসিমা।

.

পারুল আর পারলো না। কান্নায় বিকৃত কণ্ঠে উচ্চারণ করল, আমি কী করব? আমি এখানে থাকতে পারব না। আমাকে তুমি নিয়ে যাও।

পাগল। আমার জন্য তুই মরবি কেন? আর আমি চলে গেলেই নাসিমা হাসতে চেষ্টা করল এখানে কেউ কিছু বলবে না। মানুষের নীচতাকে আমি ভয় পাই, পারুল। শক্তি নেই, নইলে লড়তাম। তাই পালিয়ে যাচ্ছি।

আমারো শক্তি নেই নাসিমা আপা।

আছে।

দৃঢ়কণ্ঠে এই উত্তরটা নাসিমা বিশেষ করে উচ্চারণ করল।

—-আছে, থাকবে না কেন? সবাই কি আমার মতো?

পারুলের জন্যে আমার মমতা হচ্ছে। কিন্তু আমি কী করব?

আমি চলে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে জানি, কিন্তু আমার উপায় নেই। পারুল, শোন—-

পারুল আঁচলে মুখ ঢেকে বলল, তুমি কী নিষ্ঠুর নাসিমা আপা।

নাসিমা তখন চুপ করে ভাবতে লাগল পারুলের মুখ, যা সে গতরাতেও চুমোয় চুমোয় নিবিড় করে তুলেছিল।

নাসিমার সমস্ত শরীর জ্বালা করতে লাগল। পুড়ে পুড়ে যেতে লাগল একেকটা স্নায়ু। পারুলকে একেলা ফেলে বাথরুমে এলো নাসিমা। এসে গায়ে পানি ঢালতে লাগল টাব থেকে।

পারুল বোধ হয় কাঁদছে। আমি যে মরে গেছি, একথা পারুল বুঝবে কী করে? এখন দূর থেকে শুধু ওর দুঃখটা বুঝতে পারি, কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার শক্তি আর আমার নেই।

.

কলকাতা থেকে চলে এসে নাসিমা নতুন করে একটা মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল পারুলের সান্নিধ্যে। স্কুলের সবচেয়ে তরুণী শিক্ষয়িত্রী পারুল—- যে স্কুলে পড়াতে এসেছিল নাসিমা। প্রথমদিন ওর মুখ দেখে নাসিমার মনে হয়েছিল পারুল বড় অবলম্বনহীন। কিন্তু কত আপন, কত চেনা। একেকটা মুখ এমনি মিলে যায় পথ চলতে চলতে যাকে খুব চেনা লাগে—-মনের কোনো একটা অস্পষ্ট মুখের সঙ্গে আশ্চর্য রকমে মিলে যায়। নাসিমা বেঁচে গিয়েছিল পারুলকে পেয়ে। বোর্ডিং হাউসে নিজের কামরায় নিয়ে এসেছে ওকে কদিন পরেই। প্রথমে একটা ভয় ছিল পারুলের দিক থেকে, কিন্তু পরে দেখা গেছে, পারুলও যেন কতকাল ধরে প্রতীক্ষা করছিল নাসিমার জন্যে। পারুল বলেছিল, আমার মনে হয় তুমি না এলে আমি মরে যেতাম।

নাসিমা তখন বলতে পারেনি—-পারুল, তোমাকে না পেলে মরে যেতাম আমিও।

কী পেলাম বা কী পেলাম না—- এ প্রশ্ন পারুল আর তার ভেতরে জাগবে না কোনদিন। শুধু আত্মার সান্নিধ্য। শুধু উত্তাপ।

প্রবীর, আনিস, লাবু চা বাগানের সেই পশু–ওদের আঘাত করবার হাতিয়ার থেকে কত মুক্ত নাসিমার এই নতুন জীবন। ঘৃণায় অবিশ্বাসে যার মন ভরে উঠেছে তার মুক্তি কি আছে এমনি করে?

কোনো কোনো রাতে পারুল উঠে আসতে তার বিছানায়। তার উত্তাপে স্পন্দিত হয়ে উঠতে সে। পশুর উত্তাপ নয়; কোমল, শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন একটা অনুভূতি। পারুল এতটুকু হয়ে আছে তার বুকের ভেতরে। এইসব মুহূর্তে চিরদিনের মত মরে যেতে পারত নাসিমা।

.

গোসল সেরেও জ্বালাটা কমলো না। ফিরে এসে দেখল পারুল ঘরে নেই। থাকবে বলে মনে মনে আশা করেছিল নাসিমা।

এখানকার সবাই তার বিরুদ্ধে চলে গেছে পারুলকে কেন্দ্র করে। কাদা ছড়িয়েছে। ছি–ছি ছি। না, ও কথা আর মনে করবে না নাসিমা। নিজে রেজিগনেশন দিয়ে চলে যাচ্ছে—- এর বেশি তার কিছু করার ছিল না। একেক সময় মানুষের উদ্যত জুতোর মুখে নিজেকে এত অসহায় মনে হয়। স্কুলের সেক্রেটারী খুশি হয়েছেন একটা ক্ষত সারানোর গৌরবে। রেজিগনেশন লেটার হাতে নিয়ে তার মুখ দেখার মত হয়ে ছিল। অতি দুঃখে, ঘৃণায় হাসি। পেয়েছিল নাসিমার।

পারুল জানে, আমি বিনষ্ট কোনো বাসনার হাতে নিজেকে তুলে দিইনি। আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না, কাউকে না। আমার যে কত বড় আনন্দ এনে দিয়েছিল পারুল পারুলও জানবে না। তার জন্যে আমার দৃঢ় মুখটাই চিরকালের জন্য সত্যি হয়ে থাকবে। যাবার আগে নাসিমা কাছে ডেকে নিল পারুলকে। বলল, তোকে মমতা দিয়ে কবর দিলাম। আমি যাই।

পারুল উত্তরে কিছু বলল না। তখন নাসিমা কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে প্রায় ফিসফিস কণ্ঠে উচ্চারণ করল, নিজেকে কোনদিন মরে যেতে দিস না, পারুল।

আর কিছু বলল না নাসিমা। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বাইরে দাঁড়ানো রিকশায় গিয়ে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে দুচোখের সমুখে বিছিয়ে থাকা কাঁচা রাস্তাটাকে তার মনে হলো কত দীর্ঘ। এক বছর ধরে চেনা এখানকার দুপাশে বাসা বাড়ি গাছ মনে হলো কত অপরিচিত।

.

সারারাত খুব বাতাস বইছে। সেই বাতাসের হাহাকার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল নাসিমার। পৃথিবীতে আজ এত হাহাকার কেন? কান পাতলে যেন একটা উত্তর শোনা যাবে দূর পৃথিবীর অন্তস্থল থেকে।

নাসিমা উঠে পানি খেয়ে এসে শুয়ে পড়লো আবার। বালিশটাকে আঁকড়ে ধরলো শিশুর মতো। আরজুর এই শোবার ঘর যেন আস্তে আস্তে বাতাসের ধাক্কায় বিশাল থেকে বিশালতর। হয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হচ্ছে তাকে আরো ক্ষুদ্র করে দিয়ে। বেবির মুখ অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে চেষ্টা করলো নাসিমা। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলো না। এমন কি মুখের সামান্য একটা ভঁজ কিংবা একটা কোণও তার মনে পড়ল না। আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অথচ আজ শিশুরাত্রিতে তার মুখ আমি দুহাত ভরে তুলে নিয়েছিলাম।

নাসিমার মনে হলো সে একটা ভাসমান পাটাতনের ওপর শুয়ে আছে। দুলছে। ফুলে ফুলে উঠছে।

বেবির মুখ মনে করবার চেষ্টাটাও এক সময়ে হারিয়ে গেল। শুধু একটা শূন্যতা। আর বাতাসের ভয়। আর আরজুর কামরার বিশালতা। নাসিমা বালিশটাকে আরো আপন করে আঁকড়ে ধরলো সারাটা শরীর গুটিয়ে এনে এতটুকু একমুঠো করে।

.

আনিস বলেছিল তোমার মুখ আকাশের মতো। কৈশোরের সেই রক্তিম বয়সটা থেকে শুরু করে তেইশ বছর বয়স অবধি তাকে পূর্ণ করে রেখেছিল আনিস। আনিসকে তার আত্মার চেয়েও গভীর করে ভালোবেসেছিল নাসিমা। পৃথিবীকে আমার অযুত কৃতজ্ঞতা,

আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমার মৃত্যুর মুহূর্তেও যেন দুচোখ ভরে উজ্জ্বল হয়ে থাকে আনিসের মুখ।

কিন্তু সাপ–সাপকে কি কেউ মনে রাখে?

আনিসের অস্তিত্ব একটা সাপের মত পিচ্ছিল, কূঢ় সত্তায় রুপান্তরিত হয়ে গেছে এক সময়ে। তোমাকে আমার অদেয় ছিল না কিছু। তুমি আর কী চেয়েছিলে আমার কাছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর সে কোনদিন পাবে না।

শুধু একদিন সে তাকিয়ে দেখেছে—-আনিস দূরে সরে যাচ্ছে। আনিস খুঁজে নিচ্ছে তার নতুন বন্দর।

হামেদ তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, সিমু, তোর কী হয়েছে বলতো? কিছু না, কিছু না।

কিন্তু কণ্ঠস্বর ছিল তার বাষ্পে আকুল।

মনে আছে, হামেদ তখন তাকে খুশি করে তুলবার জন্যে কী–ই না করেছে। হামেদ তো। জানতো না, আমার এ দুঃখ অন্তরে বাহিরে এমন কিছু নেই ভুলিয়ে দেয়। হামেদ তাকে সারাক্ষণ নিয়ে বেরিয়েছে সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, জিনিস কিনে দিয়েছে রাশ রাশ।

বলেছে, তোর যা খুশি বল—–- আমি আছি কী করতে? আমি এনে দিচ্ছি। একেক সময় নাসিমারও বিশ্বাস করতে লোভ হতো এমনি করে হয়ত সে পেয়ে যাবে একদিন সব ভোলানো এক বিস্মৃতি। মগ্ন হয়ে থাকতো, থাকতে চেষ্টা করতো। কিন্তু কিছুতেই যে আর কিছু হবে না, একেকটা মনের মনে রাখবার ক্ষমতা যে এমনি অসাধারণ, এটা সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল আরো অনেক পরে।

কিন্তু তখন একেকদিন খুব করে সজ্জা করে, নতুন কেনা উজ্জ্বল শাড়িটা পরে, বাইরের চলমান স্রোতে নিজেকে প্রবাহিত করে দিয়ে ভাবতো এই আমি বেরিয়ে আসতে পারছি স্মৃতির থাবা থেকে। হয়ত তা সফলও হতো কিছুক্ষণের জন্যে, কী একটা দিনমানের জন্যে, কিন্তু যখন হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ত তখন দিনের পর দিন চোখ তুলে কারো দিকে তাকাবার শক্তিটুকু অবধি থাকতো না। নিজেকে তখন চরম একটা অবহেলা আর অযত্নের হাতে ছেড়ে দিয়ে নাসিমা শিক্ষিত করত নিজেকেই। এতটুকু কষ্ট তার সইতে পারেনি কেউ কোনদিন। হামেদও না। বার থেকে যতটুকু বোঝা যায় তার কষ্টের রূপ দেখে হামেদ ব্যথিত হতো, কিন্তু কিছুই করতে পারত না।

হামেদের আকুলতা দেখে নিজের ওপরেই আক্রোশ হতো নাসিমার। কেন আমি হামেদকে বিচলিত করে তুলছি তার মমতামূল অবধি?

একদিন সকালে উঠে সে প্রাণভরে নাইলো। নেয়ে আসবার পর নাশতার টেবিলে বসে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, আবার সে পড়বে। এম. এ. দেবে—- সেটা এতদিন শুধু উৎসাহের অভাবে পড়ে ছিলো। হামেদ বলল, বেশ তো।

হামেদের স্বস্তি–সুন্দর মুখখানা তখন কী যে ভালো লেগেছিল নাসিমার।

—-পরীক্ষা দিবি এতো ভালো কথা। আমিও এদ্দিন তাই ভাবছিলাম। চল আজকেই, রি অ্যাডমিশন করিয়ে নি, কী বলিস?

চলো আজকেই। আর কিছু বইও কিনতে হবে। আর আমাকে, ভাইয়া, পড়বার জন্যে, হালকা একটা চেয়ার কিনে দেবে কেমন?

এত স্বচ্ছ সহজ কণ্ঠে সে কথা বলতে পারছিল তখন যে তার নিজের কানেই মনে হচ্ছিল অন্য কারো সুন্দর স্বর সে শুনতে পাচ্ছে।

হামেদের তখুনি হুকুম হলো বারান্দার কোণ খালি করে দেয়ার জন্যে। ওখানে সকালের রোদে, ঘরে যদি ভালো না লাগে, নাসিমা পড়তে পারবে। আর স্ত্রীকে বলল বাক্স থেকে একটা পর্দা এনে কোণটাকে আড়াল করে দিতে।

সন্ধ্যের ভেতরেই হামেদ এত নিপুণ হাতে সব আয়োজন করে দিল যে, নাসিমার মন ভীষণ রকমে প্রসন্ন হয়ে উঠলো। অনেক রাত অবধি পড়লো সে সেদিন।

সেই মাসগুলোতে সুখ কিংবা দুঃখ কিছুই আর সে যেন অনুভব করতে পারত না। এমনি করে পরীক্ষা দেয়া অবধি। নিজেকে সে একটা কোনো বৃত্তিতে নিযুক্ত রাখতে

পেরেছে এটাকে তখন অবধি মুক্তি বলে মনে করলেও পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর তা রইলো না।

আবার নিঃসঙ্গতা। আবার বরফের কুচিতে যেন সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে এমনি প্রাণহীন শীত। দূর থেকে কতদিন আনিসকে দেখেছে কিন্তু মুখ ফেরায়নি। আনিসের জন্যে কষ্ট পাবে কিন্তু আনিসের কাছে আর সে ফিরে যাবে না।

.

এই কষ্ট পাওয়ার নেশা বিস্তৃত হয়ে ছিল বিয়ের পর অবধিও। বরং আরো নিবিড় করে অনেকদিন মনে পড়েছে সেই মানুষটাকে যে তার আত্মাকে চিরকালের মত নিঃসঙ্গ করে গেছে।

আর লাবু চা বাগানের সেই মানুষটার নাম কী ছিল? আশ্চর্য তার নামও আনিস। শুধু উপাধিটা আলাদা।

নাসিমা প্রথম দিনই নাম শুনে চমকে উঠেছিল। কিন্তু বুঝতে দেয়নি হামেদকে। মনে মনে তার ভাবনা এসেছে, যেন এক নামের দুটো মানুষ—-একটা সাধারণ বিন্দু থেকে পরস্পরের বিপরীতে তীরের মত দুটি রেখা ছুটে গেছে। তাদের গতিতে, দৈর্ঘে, বর্ণে কোনো মিল নেই। অস্পষ্ট একটা সহানুভূতি কিংবা সঠিক করে বললে কৌতূহল হয়ত গড়ে উঠেছিল এই নতুন আনিসের জন্যে।

লাবু চা বাগানের ম্যানেজার আনিসের বাংলো আলো করে আমি এসেছিলাম। কিন্তু সে আলো নিভিয়ে দিয়েছে আনিস নিজে।

.

বাংলার দুকামরার মাঝখানে উঁচু টুলের ওপর জ্বলছিল পেট্রোম্যাক্স।

শরীরটা ছায়ায় আবৃত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিল নাসিমা। ম্লানগতি চলচ্চিত্রের মত শিথিল ভাসতে ভাসতে ছায়াটা তাকে জড়িয়ে ধরছে, শ্বাপদের আলিঙ্গন যেন।

নাসিমা জানে কে এলো। এমনি ছায়া আজ কয়েক মাস ধরে তার শরীরে পড়েছে। তাই প্রথমে চমকে উঠলেও মুখ ফেরাল অনেকক্ষণ পরে, আস্তে আস্তে।

মুখ ফিরিয়ে দেখল—- আনিস। খাকি ট্রাউজার এখনো পরনে, সেটা পরে সারাদিন চা বাগান ঘুরে এসেছে। কেবল উধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত। হাতে হুউস্কির গ্লাস প্রায় আদ্ধেকটা এখনো ছলছল করছে গলিত সোনার মত।

আনিস কোনো কথা বলল না। তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। নাসিমার মনে হলো একটা পাহাড় তার পেছনে বিপজ্জনক রকমে বেড়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। কেন কোনো কথা বলছে না আনিস?

কথা নয় পানীয় পানের শব্দ পেল নাসিমা।

গ্লাসটাকে টুলের ওপর রাখতে রাখতে আনিস বলল, আমি জানি তুমি কার কথা ভাবছ।

নাসিমা যেন জানত আনিস এ কথা বলবে তাই স্তব্ধ হলো না তার রক্তপ্রবাহ। এমন কি যখন হঠাৎ আনিস চিৎকার করে উঠল, তখনও না। আনিসের বীভৎস দ্রুত কণ্ঠস্বরে বাংলোর দেয়ালে দেয়ালে করাঘাত বেজে উঠল যেন।

আমি চাই না আমার সমুখে কেউ থাকবে। বুঝেছ? ইউ আন্ডারস্ট্যাণ্ড?—-নো মেমোরি নাথিং—-আই হ্যাড এনাফ অফ দোজ।

নাসিমা কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল। চলে গেল পাশের কামরায়। স্মরণ কি পাপ? ভাগ্যের পরিহাস, দুজনেরই এক নাম।

চলে যেতে যেতে নাসিমা শুনতে পেল আনিস তার চেয়ারটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল। তারপর আর কিছু না। অন্ধকার কামরায় গিয়ে শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিল

নাসিমা। শুধু শরীর নয়, মনের দিক থেকেও এত ক্লান্ত লাগছে তার যে সামান্যতম প্রতিবাদেরও কোনো স্পৃহা নেই তার।

আনিস হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল দেখে একবার মনে হলো উঠে গিয়ে দেখে আসে কী হলো লোকটার?—-যেন চিৎকার করে সব কিছু ছিটিয়ে ছড়িয়ে ফেললেই সে নিশ্চিত হতে পারত। তারপর বালিশে মুখ লুকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে এক সময়ে। আস্তে আস্তে মন থেকে কান্নার স্পষ্ট কারণটা অপসারিত হয়ে গেল—-শুধু বেঁচে রইলো কান্না।

.

তুমি মদ খাও আনিস, আমি তাতে কোনদিন কিছু মনে করিনি। বরং বিয়ের পর এখানে এসে যেদিন জানলাম, মনে মনে একটা আঘাত পেলেও, বার থেকে আমার হাসিমুখ দেখে তুমি যে প্রীত হয়েছিলে সেটাই ছিল আমার সোনার মত পাওয়া।

আমি তোমাকে অবলম্বন করে পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু বিপরীতে আমাকে তুমি বুঝতে চাইলে না। আনিসকে আমি ভুলে যেতে পারিনি, কিন্তু তোমাকে তো ফিরিয়ে দিই নি? সুদূর একটা দ্বীপের মত করে কাউকে মনে রাখা কি পাপ? আনিস আমার জন্যে মরে গেছে। মৃতকে যদি ভুলে গিয়ে না থাকি তার মানে কি এই যে, জীবিতকে আমি অস্বীকার করছি? নিজেকে আমি শ্রদ্ধা করব না? আমার ফেলে আসা আমাকে?

বিয়ের পর নাসিমা মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছিল স্বামীকে। নিজেকে নিবিড় আলিঙ্গনে সঁপে দিয়ে বলেছিল, যখন আনিস শুধিয়েছে, তোমার কথা বলো। বলবে?

বলবো।

তারপর প্রথম প্রেমের কথা বলতে গিয়ে, তার নামও ছিল আনিস।

মরে গেছে?

আমার কাছে।

তখন আনিস বুঝতে পারেনি—- আনিস মরে গিয়ে কী চরম শোধ নিয়েছে তার ওপরে। তখন সে বলেছে, আমি তোমার আনিস। যে গেছে সে চলে গেছে।

যে গেছে সে চলে গেছে সত্যি, কিন্তু মনের নিয়ম মানে না কোনো যুক্তির সিঁড়ি। বিষুব রেখা পার হয়ে এলে যেমন উত্তর থেকে এসে থাকি দক্ষিণে—-আর দুচোখে থাকে না তখন উত্তরের আকাশ, তখন শুধু দক্ষিণ, মনের পৃথিবী তো তেমন নয়!

একটা ছবির ওপর আরেকটা ছবি এসে পড়ে, দুটো মিলে নতুন ছবি হয়। পেছনেরটা মুছে যায় না। পরে পরে আরো ছবি–আরো আকাশ। আঘাতের পর আঘাতে ভেঙ্গে যেতে

থাকে প্রেক্ষিত। জ্বলে পুড়ে তখন ছাই হয়ে যেতে থাকে হৃদয় আর আত্মা আর স্মৃতি আর স্নায়ু আর চেতনা যে আগুন আজ জ্বলছে নাসিমার।

সেদিন যদি তার কখনো কখনো এই মনে রাখা মেনে নিতে পারত আনিস, তাহলে কী হতো? তাহলে আমাকে বারবার মরে গিয়ে নতুন জন্মের জন্য অধীর হয়ে উঠতে হতো না। তুমি আমার, সম্পূর্ণ আমার, কমপ্লিটলি, আর কারো কথা আমি জানতে চাই না।

আনিস ঘরে এসে নতুন করে পানীয় ঢালতে ঢালতে বলল—- দেয়ার মাস্ট বি নো ওয়ান। ইউ হিয়ার?

আবার কান্না পেল নাসিমার। সম্পূর্ণ করে সে দিতে চেয়েছে, দিয়েছে নিজেকে। যদি মনে পড়ে থাকে প্রথম প্রেমের কথা, তা কি তুমি সৃহ্য করতে পারো না? মনে মনে সে মিনতি করল স্বামীর উদ্দেশে আমাকে তুমি এতটক দাও, তোমাকে আমার কোনো অনীহা স্পর্শ করবে না, আমার মনে কোনো মালিন্য নেই—- এ কথা তুমি বিশ্বাস করো একবার।

আনিস ডুবে যাচ্ছে নেশায়। শেষ পানীয়টুকু তা সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেল। তখন যেন উদ্দাম হয়ে উঠলো সে।

দিনের পর দিন দেখে আসছি, তুমি—-তুমি ভুলতে পারছ না।

নাসিমা এত বড় অপবাদ সইতে পারল না। কখনো কখনো সে স্মরণকে ফিরিয়ে এনেছে বৈকি, সেটাই অসহ্য হয়ে দাঁড়াল? বলল, তুমি ভুল করছে।

লায়ার।

সব তোমার ভুল।

ইউ বিচ।

শোনো, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না, আমি তোমারই। ছি-ছি লোকে কী ভাববে বল তো? বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল নাসিমা। আনিসের শেষ কথাটা যেন এতক্ষণে তার কানে গিয়ে পৌঁচেছে। কয়েক মাসের মিনতির পুতুল সে আজ চূর্ণ চূর্ণ করে ভেঙ্গে ফেলে দিল। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঋজু গলায় উচ্চারণ করল, আমার ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে যাও। যাও বলছি। একশো বার আমি মনে করব, আমার যা খুশি করব, তোমার কী তাতে?

পশু, ছোটলোক। শ্রদ্ধা নেই যার হৃদয়ে তাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার হৃদয় তুমি থুতু দিয়ে ভরে তুলেছ। আমি তোমাকে ক্ষমা করব কী করে?

কিন্তু আনিস নড়লো না। তখন নাসিমা নিজে বেরিয়ে এসে পাশের কামরায় খিল তুলে দিল। সারাটা শরীর তার বেতস–লতার মত থরথর করে কাঁপছে। দ্বিতীয় মৃত্যুর অনুভূতি বুঝি এমনি হয়।

অনেকরাত অবধি সেদিন লাবু চা বাগানের ম্যানেজার তার দরোজায় করাঘাত করেছে। শিলাবৃষ্টির মত আর অভিশাপ।

নাসিমা। নাসিমা। নাসি—-মা–আ।

তবু সে দরোজা খোলেনি।

আই উইল কিল দ্যাট সোয়াইন। আই হেট হিম। গিভ মি মাই গান। ইউ কাম আউট, নাসিমা।

তার উঁচু পর্দাটা নেমে এসেছে। থেমে গেছে করাঘাত। তখন বিড়বিড় করে, লেট মি ইন লেট মি ইন—-লেট মি ইন।

ঘুমের মত তার কণ্ঠস্বর যেন আস্তে আস্তে তলিয়ে গেছে। আর সারাক্ষণ নাসিমা অন্ধকারে লড়াই করেছে নিজের সঙ্গে।

.

এর পরে তাদের আর কোনো কথা হয় নি। পরদিন বিছানা পাশের ঘরে নিয়ে এসেছে নাসিমা।

চারদিন পর। সেদিন দুপুরে ঘুমিয়েছিল তার বিছানায়। সারাটা বাংলো দুপুরের নিশুতি নূপুরে আর বাইরের চোখ ধাঁধানো রোদে নিমগ্ন হয়েছিল।

হঠাৎ কী একটা শব্দে আর নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যেন কেউ তাকে জাগিয়ে দিল অতি সন্তর্পণে। মুখ ফেরানো ছিল জানালার দিকে। চোখ মেলেই পাহাড় আর স্তব্ধ নিবিড় আকাশ। অনুভব করল মনে মনে সেই মানুষটার উপস্থিতি। তুমি কি অনুতপ্ত? আমি আর বহন করতে পারছি না, আমার অভিমান এত বিশাল হয়ে উঠেছে। তুমি একবার ডাকো, ক্ষমা করবার জন্যে আমার মন আকুল হয়ে আছে। ধীরে ধীরে মুখ ফেরালো নাসিমা।

চোখে চোখ পড়তেই যেন বধির হয়ে গেল সে। চিৎকার করে উঠল, না—-না।

আনিসের মুখ অনুতাপে নয়, লালসায় ক্ষুধায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। ঠিক তখন সমস্ত শরীর আর মন ঘৃণায়, বিদ্রোহে, বঞ্চনায় বিদীর্ণ হয়ে গেল। একটা বমি উলটে আসতে চাইলো পাকস্থলী থেকে। জট পাকিয়ে কঠিন হয়ে গেল শরীরের প্রতিটি স্নায়ু। এ তুমি কি করলে আমার?

এরপর দুদিন পর পর ফিট হলো নাসিমা। আনিস দৃষ্টি করলেই, মনে হতো কতগুলো কীট যেন শরীর বেয়ে উঠতে চাইছে। গোসলের জন্যে মনটা অধীর হয়ে উঠতো। মিথ্যে, সব মিথ্যে। শরীরটাকে তখন একটা ভার মনে হতো তার যা তাকে চিরকাল বইতে হবে।

কাদার আলপনা আর থুতু। কাকে আমি ক্ষমা করতে চেয়েছিলাম? আমি সাজিয়ে নেবো আমার পৃথিবী আমার জন্যে। আমার অহংকার তোক নির্মম।

আসামকে পেছনে ফেলে কলকাতায় এলো নাসিমা।

৪. উজ্জ্বল রোদে সারা বুড়িগঙ্গা

উজ্জ্বল রোদে সারা বুড়িগঙ্গা যেন সোনা হয়ে আছে। ঢেউয়ের দোলায় উঠছে পড়ছে নৌকো, ছোট বড় নৌকো। দুপাশের ছড়ানো গ্রাম আর দূরে ঘন গাছের সারি আর খেত মাঠ—-জল রংয়ে আঁকা বিশাল একটা ছবির মত মনে হচ্ছে।

পৃথিবীতে এত আলো আছে, নাসিমা কি তা জানতো?

ছইয়ের পিঠে হেলান দিয়ে, শরীরের নিচে শীতল স্রোত প্রবাহ অনুভব করতে করতে নাসিমার মনে হলো, যে মুখটা ছাইমাখা হয়েছিল এতকাল, আজ হঠাৎ তা ধৌত হয়ে গেছে। পৃথিবী তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তার এই রৌদ্র দিয়ে। বেবিও পাশের গলুইয়ে চুপচাপ বসে দাঁড় টানা দেখছিল।

দিনের আলোর এমন একটা জয়ী মনোভাব আছে যে রাত্রির সমস্ত চিন্তা, চেতনা আর সিদ্ধান্তকে হাস্যকর করে দিতে চায়। কাল রাতে নাসিমার যে সংলাপগুলো তাকে স্বপ্নের সংকেত এনে দিয়েছিল আজ তা মনে করে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠছে বারবার বেবি।

নৌকোয় আসবার উদ্যোগটা ছিল নাসিমার।

কতদিন সাঁতার কাটিনি। এখানে সাঁতারের সুবিধে নেই, বেবি?

কি জানি। ভালো পুকুর তো নেই।

নদী? ভাড়া নৌকো মেলে না?

খুব।

তাহলে কাল চল। যাবে?

আজ তাই বেরুনো।

বেবির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে নাসিমা আশ্চর্য রকমে কদিন থেকে শান্ত হয়ে আছে। কেবল একটা মুক্তি, একটা পরমপ্রাপ্তি, দীর্ঘকাল ধরে কেবলি বঞ্চনার পর। সেই সুখ হীরে হয়ে আছে নাসিমার সত্তায়।

নাসিমা বাইরের উজ্জ্বল পৃথিবীর সঙ্গে বহুদিন পরে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করছে আজ। পেছনে কত দূরে ফেলে এসেছে ঢাকা।

বেবি।

বেবি তখন এপাশে এসে বসলো। বসে চলমান দৃশ্যের দিকে মনোযোগী দৃষ্টি করে রইলো। কী ভাবছ?

সূচিপত্র

কই কিছু না। দেখছি।

মিছে কথা। আমি জানি তুমি কী ভাবছ। বলব?

নাসিমা ব্যথা অনুভব করলো বেবি লুকোচ্ছে বলে। আসলে হয়ত বেবি লুকোয়নি কিছুই ওটা নাসিমারই একতরফা ধারণা। বেবির চুলে হাত দিয়ে কাল রাতে মুঠো করে ধরতে ধরতে সে একটা বিয়োগ অনুভব করেছে। তীব্র একটা বিয়োগ। কেন এই ব্যর্থতা? বেবির সমস্ত কিছু সঞ্চিত, উঘাটিত, মিলিত হোক তার অন্তরে। আর কোনো বাধা, কোনো দূরত্ব, কিছুই নয়। এমন কী দুরাশায় তার মনে হয়েছিল বেবি গলে গলে সুধা হয়ে যাক, আমি সেই সুধা পান করবো।

বেবি তার সমস্ত আদর আর প্রশ্নের মুখে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু তার মনে হয়েছে, এই মুহূর্তে বেবি কী ভাবছে তা আমি কোনদিনই জানতে পাবো না। কিন্তু কেন? প্রশ্ন করে নি, কেননা, অভিজ্ঞতা তাকে বলেছে আমরা কত কম বলতে পারি, তুলনায় যা আমরা বলতে চাই। আর যদিও বা বলতে পারি, সেই প্রকাশের স্বরূপ কখনোই হয় না যথার্থ। তাই কী লাভ? যদি এমন হতো, যে আমার আপন তাকে কোনো প্রশ্ন না করে শুধু স্পর্শ দিয়ে স্পষ্ট করে জানতে পেতাম তার আত্মার প্রতিটি তরঙ্গ।

একেকটা মানুষ তার শরীরে নিজস্ব একটা পৃথিবী। একটা বিরাট আকর্ষণ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে নতুন একটা সৌরকক্ষের দিকে—-পরস্পর সেই আকর্ষণ-কেন্দ্র থেকে ধার করা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে পারে কিন্তু যে কোনো কোণ থেকে মিলিত হওয়ার বাসনায় জ্বলে ছাই হয়ে শুধু নিশ্চিহ্নই হবে—- আর কিছু নয়। ব্যবধান কি তাই?

নাসিমা আখতার, আমরা কেউ উত্তর দেব না এই প্রশ্নের। একমাত্র যাকে তুমি শ্রদ্ধা জানাতে পারো তা মৃত্যু। একমাত্র যা তুমি অবলম্বন হিসেবে পেতে পারো তা মৃত্যু। একমাত্র যাকে তুমি নির্ভর করতে পারো তা মৃত্যু। আত্মার ভিতরে, পৃথিবীর জ্বলন্ত কেন্দ্রের মত, গুপ্ত, গতিমান মৃত্যুর অমর চক্র।

.

পাড়ে নেমে নাসিমা যেন হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে গেল। এমন একটা চঞ্চলতা সে অনুভব করল তার শরীরে যা দুরন্ত বাতাসে কাঁপন লাগা পাতার অনুরূপ। নেমেই বলল, কী সুন্দর না?

উত্তরের অপেক্ষা করল না। চঞ্চল চোখে দৃষ্টি করতে লাগল চারদিকে, যেন মুহূর্তের সামান্যতম প্রাপ্তিকেও সে হারাতে চায় না। পায়ের স্যান্ডেল ছুঁড়ে ফেলে বলল, তুমি নাইবে না?

বারে, নইলে এলাম কেন?

বেবিরও তখন সেই লজ্জাটা হারিয়ে গেছে। তার তরুণ মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে রৌদ্রে। কথা বলতে বলতে সে শার্ট খুলে রাখলো। একে একে খুললো ট্রাউজার, ঘড়ি আর মোকাসিন। তারপর সবগুলো জড়িয়ে নৌকোয় ব্যাগের ভেতরে রেখে এলো। নৌকোটা এখান থেকে অনেক দূরে।

নাসিমা পানিতে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে ডুবতে লাগল তার শরীর। যখন শুধু গলা অবধি জেগে রইলো তখন বেবি দ্রুত দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পাশে পানি আর রোদ ছিটিয়ে। টুক্ করে নাসিমা কপট বিরক্তিতে সরে গেল দূরে। আর তাকে ধাওয়া করলো বেবি। এক সময়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো দুজনে।

দিনের আলো আর বেবিকে বিব্রত করছে না। অন্য এক পৃথিবীতে কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসতে হাসতে পানিতে হাসিতে একঠায় হয়ে গেছে নাসিমা।

এই বেবি!

নাসিমা একটা চাপড় দেয় কাঁধে আদর করে, কিন্তু মুখরেখায় ফুটিয়ে রাখে শাস্তি দেয়ার একটা প্রকট অভিব্যক্তি।

আমি তোমাকে কোনো মূল্যেই প্রতারিত হতে দেব না, বেবি।

বেবি তখন দ্রুত পানি ঠেলে হাঁপিয়ে তোলে নিজেকে। ফস ফস ডুব দেয় আর মুখ তোলে। বেবিকে আমি এত ভালোবেসেছি যে আমার হৃদয়ে তার কুলান হবে না।

.

পানিতে ভিজে দুজনের মুখ নতুন হয়ে উঠেছে। দুজনকে দেখাচ্ছে যেন দুটো বিরাট মাছ। নাসিমা বেবির পাশাপাশি সাঁতার দিতে থাকে।

বেবি।

উ।

বেবি।

বলো। বলো না?

না, কিছু বলবো না। তোর নাম ধরে শুধু ডাকব। ডাকব?

বেবি কিছু বললো না। এমনকি নাসিমার মুখে কখন যে সে তুমি থেকে তুই–তে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তা বুঝতেও পারলো না। শুধু ভাবলো, নাসিমা তাকে এমন করে বেঁধে ফেলেছে যে আর কোনদিন তার বাঁধন থেকে সে মুক্ত হতে পারবে না।

বেবি, তুই দুষ্টু। ভারী দুষ্টু। দুষ্টু, দুষ্টু।

নাসিমা বেবির গায়ে পানি তুলে মৃদু আঘাত করতে করতে আধো চোখ বুজে উচ্চারণ করতে থাকে। আমার সব প্রীতি তোর জন্যে। স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল তার হৃদয় পাত্র থেকে কী এক নামহীন তরল আধেয় আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। আর শূন্যতাটুকু ভরে উঠছে বেদনার মত মধুরতায়।

বেবি যেন পানিতে ভিজে ভিজে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

বেবি উঠে এলো। তখনো পানিতে রইলো নাসিমা।

বেবি তাকে ভুল বুঝবে না। এই বিশ্বাসে এখন তার মন নত হয়ে এলো। বেবিকে সে কিছুতেই হারাতে পারে না। বেবি প্রবীর নয়, আনিস নয়, বেবির জন্যেই যেন সে দীর্ঘকাল মৃত্যুর পর মৃত্যু পার হয়ে এসেছে। বেবি, আমার বেবি।

নাসিমা গা ভাসিয়ে দিয়ে রইলো পানিতে।

মনের সমস্ত জটিল গ্রন্থিগুলো যেন খুলে যাচ্ছে একের পর এক অপরূপ এই শীতলতায়। মনে হলো অনেক ওপরে উঠে গেছে, পৃথিবীর মালিন্য ছাড়িয়ে, বাইরের নিয়মের বর্শা এড়িয়ে ওপরে অনেক ওপরে—-তার নির্মম অহংকার নিয়ে আত্মীয়তায় প্রীত হয়ে উঠেছে তার আত্মা সেই ঊর্ধ্বের সঙ্গে।

শৈবাল লতার মত নাসিমা আখতার শীতল–সবুজ, ভাবনাহীন, প্রয়াসহীন, প্রসারিত, দীর্ঘ, প্রবাহিত, আকণ্ঠ হতে লাগল দুপুরের বুড়িগঙ্গায়।

একটা ছায়ায় বসে প্যাকেট থেকে লাঞ্চ খেলো তারা। দুজনে দুজনার জন্যে এত প্রস্তুত হয়ে উঠেছে যে বড় একটা কথা হলো না এই সময়ে। বেবির মন চলেছে একটা সরল রেখায় নিজের কাছে অস্পষ্ট উৎস থেকে উৎসারিত কৃতজ্ঞতায় সে তখন থেকে বিনম্র, বাকহীন। অন্যদিকে নাসিমা যখন ছায়াটায় এলিয়ে শুয়ে পড়ল আকাশের দিকে মুখ করে তখন তার মনে নতুন একটা রূপ গড়ে উঠছে কোমল আভার মত আস্তে আস্তে।

যে পৃথিবী আমি সৃষ্টি করতে চেয়েছি, তোমার নিষ্ঠুরতায় তা বারবার ভেঙ্গে গেছে। আমি সরে এসেছি। পালানো, শুধু পালানো। থুতু আর কাদার আলপনা ধৌত করে অমলিন হতে পারলাম না—-এড়াতে পারলাম না স্মৃতির নখর। পালানোর শক্তিটুকুও আজ আমার শেষ হয়ে গেছে। এক মুহর্তে যা সত্যি বলে আঁকড়ে ধরি, পর মুহূর্তে তা মিথ্যে হয়ে যায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়।

কেন একেকটা মানুষ হবে অমন নিষ্ঠুর? হয়ত আমাকে মরতে হবে তাই। কিন্তু আগুনে পুড়ে পুড়ে আমি খাঁটি সোনা হতে পারলাম না, হয়েছি ছাই করুণ একমুঠো ছাই। শুধু ছাই। বেবি, তুমি আমার বাহু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেও না।

.

আমাকে তোর কী মনে হয়, বেবি?

বেৰি গভীর চোখে তাকিয়ে রইল শুধু। নাসিমা তখন যোগ করল, আমাকে তুই ঘৃণা করবি? —-যেমন সবাই আমাকে করে?

না।

সত্যি। আমাকে দেখে তোর ভয় হয় না?

কেন?

আমি যে অমঙ্গল।

হোক। তুমি আমার মা।

নাসিমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আলোর মত।

আমার গা ছুঁয়ে বল, সত্যি।

বেবি তাকে স্পর্শ করলো।

প্রথম দিনে মনে আছে তোর? তুই এসেছিলি তোর প্রফেসরকে খুঁজতে। আমি তোকে বসতে বললাম। তোকে দেখে অবধি আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল তুই আমার অনেকদিনের হারানো ছেলে। আমার সন্তান নেই আমার অংশ থেকে জন্ম নিয়েছে যে চেতনা, তুই যেন তার রূপ ধরে সেদিন সন্ধ্যেয় আমার দুচোখ আলো করে এসেছিলি। বলেছিলি তোর মা নেই। মারা গেছেন সেই ক—-বে। আমি যে তোর মা তুই কি তা তখন বুঝতে পারিসনি? আমার দুবাহু আকুল হয়ে উঠেছিল তোকে ধরে রাখবার জন্যে। তুই সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলি, না?

নাসিমা যা ভাবছিল তা খানিকটা এমনি। কেবল শেষ কথাটা শব্দ হয়ে গড়িয়ে পড়ল ঠোঁট থেকে। বেবি শুধালো বুঝতে না পেরে, কবে?

কিছু না, বেবি। আমার হাতটা তুই ধরে থাক। বল, আমাকে তুই ফেলে যাবি না।

না, আমি যাবো না। আমি তোমার কাছে থাকব।

বেবি তার দুচোখ দিয়ে নীরবে এই অঙ্গীকার পাঠাল নাসিমাকে।

অনেকক্ষণ পরে নাসিমা বলল, লেখাপড়া শেষ করে বাসা নিতে পারবি না? আমি তখন তোর কাছে এসে থাকব। তারপর বউ আনব ঘরে। সোনার মত বউ।

বেবি লজ্জা পেল।

হ্যাঁ সত্যি, আমি কি মিছে বলছি? আমার কোল ভরে উঠবে তোদের পেয়ে। আমার আর কোনো ভাবনা থাকবে না। এত সুখ কি আমার সইবে, বেবি?

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিমা।

বেবি চঞ্চল হয়ে উঠলো।

অশ্রু ঝরে পড়ছে নাসিমা চোয়ালের পাশ দিয়ে, শীর্ণ কণ্ঠনালির দুপাশে। কিন্তু কোনো বিকার নেই সারা মুখে।

বেবি মুছে দিতে চাইলো অশ্রু।

কাঁদছো কেন? এই তো আমি আছি।

আমাকে কাঁদতে দে, বেবি। এ আমার সুখের দিন।

.

তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, সে টের পেল, মৃত্যু তার মুখ স্পষ্ট করে তুলেছে মনের অন্ধকার জানালায়। রক্তের ভিতর এই টের পাওয়া, ওপর থেকে যা বোঝা যায় না।

ঢাকায় ফিরে যখন এসেছিল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নাসিমা বলেছিল এ বেলাও বাইরে খেয়ে, তারপর বেড়িয়ে বাসায় ফিরবে। আসলে, বেবিকে সে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে চায় না। তাছাড়া, মতির মা–র হাসিটুকু তার কাছে বিষ হয়ে আছে কাল থেকে। ক্যাসবা–য় বসে ছিল ওরা। ঠিক তখন এই অনুভব।

বেবির কয়েকজন বন্ধু এসে ঢুকতেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে বেবি। নাসিমা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, এক মুহূর্তে বেবি আর বেবি থাকলো না—-পরিবর্তিত হয়ে গেল তার মুখ। আশঙ্কায় শুধিয়েছে, কী হলো?

কিছু না।

বলে বেবি চোর চাহনিতে তার বন্ধুদের দেখে নেয়।

বেবি কি ভয় পাচ্ছে ওদের দৃষ্টিকে? তুমি কি অনুতপ্ত হচ্ছ, বেবি?

নাসিমা চুপ করে খেতে লাগল। খেতে খেতে টের পেল বেবি তাকে দেখছে মাঝে মাঝে চোখ তুলে। আর তাকাচ্ছে দূরে, যেখানে ওর বন্ধুরা বসে হৈহৈ করছে।

বেবিকে ওরা যখন ডাকলো তখন বুকের স্পন্দন যেন মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল নাসিমার। মনে হলো পায়ের নিচে সিমেন্টে প্রাণ এসেছে—- সরে যেতে শুরু করেছে। নাসিমা জোর করে মেঝেয় পা স্থির রাখতে চেষ্টা করল।

সারাটা গা তার থরথর করে কেঁপে উঠতে চাইলো। আবার সেই মুহূর্তগুলো ফিরে আসছে, মেঝের মোজাইক যেন সরীসৃপের মত কিলবিল করছে। দূরে মেঝের শেষ সীমারেখা সমতল থেকে উঠে যেতে চাইছে ওপরে কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে তার নাম ধরে ডাকছে।

নাসিমা হাতের কাটা শক্ত করে ধরে এত জোরে যে লাগল নিষ্ঠুর দাগ বসে গেল করতলের কোমলে—-প্রাণপণ চেষ্টা করল স্থির হতে। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, না—-না।

স্থির হতে হতে শুনতে পেল বেবির কী একটা কথায় হো হো করে হেসে উঠলো ওরা। হাসিটা তীরের মত লকলক করে কাঁপতে কাঁপতে এসে পড়ে গেল তার টেবিলের ওপর।

বেবি ফিরে এলো।

কী বলল ওরা?

কিছু না।

আমার কথা?

বেবি নীরবে নড করল উত্তরে।

খুব সাধ হলো জানবার জন্যে বেবি ওদের কাছে তার কী পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু বেবি এখন এত একমনে খেয়ে চলেছে যে কোনো কথা সে তাকে শুধোতে পারল না। মনে মনে বলল, আমি জানতাম। তার অভিজ্ঞতা বলল, আমি জানতাম। তার অনেক মৃত্যু কাফন পরে উঠে এসে বলল, আমি জানতাম। সে নিজেকে অনুভব করল দ্রুত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শিথিল হয়ে আসছে তার মুঠো।

বেবি, আমি তোমাকে শক্তি দেব। কেননা তোমাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারি না।

মুখে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, বেবি। কাল তোর যে জুতোটা পছন্দ হয়েছিল, আজ কিনে দেব, টাকা এনেছি।

জুতো কেনবার পর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বেবি হাতঘড়ি দেখে বলল, রাত স'আটটা বাজে।

তা কী করবি এখন, যাবি?

সারাদিন তো বাইরে।

নাসিমা গলায় জোর এনে একটু দ্বিধার পর উচ্চারণ করে, থাক, যাবিনে এখন। পায়ে লাগছে?

জুতোর দিকে তাকিয়ে নাসিমা শুধোয়।

নাহ। বেশ হয়েছে।

কাল তোর চোখ দেখেই বুঝেছিলাম, পছন্দ করেছিস। আমাকে বলিসনি কেন? বললেই হতো।

তারপর একটু থেমে বেবির দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করে বলে, চল একজিবিশনে যাই, যাবি?

সে তো কাল যাবে বলেছিলে।

নাসিমা যেন নিভে গেল।

আজ যাবি না তাহলে?

এই জুতো হাতে নিয়ে?

বেবি আবছা কৌতুকে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। হঠাৎ তার কী মনে হয়, কী একটা নামহীন কষ্ট হয়, বলে, দাঁড়াও দোকানে রেখে যাই। কাল এসে নিয়ে যাবো।

রিকশায় উঠে বসে ওরা। বেবি সিগারেট ধরায়। হুড তোলা আবরণে ওর অন্ধকার মুখ সিগারেটের লাল আগুনে থেকে থেকে জ্বলে ওঠে। মনে হয় জ্বলন্ত তার মুখ।

হাইকোর্টের মোড়ে বিশাল গাছগুলোর অন্ধকারে যখন তারা তখন নাসিমা হাত রাখলো

বেবির পিঠে। বেবি বহুক্ষণ পরে একটা স্বস্তি অনুভব করলো। কী উষ্ণ, চেনা চেনা আর নিবিড় তার হাত। কোন কথা বলল না সে। নাসিমা একটু পর বলল, বেবি, আমার কাছে তুই লুকোবি নে বল।

কী?

ওরা কী বলেছিল?

বলেছিল—-দূর, আমি বলতে পারবো না।

তুই কিছু বলেছিস?

না। কী বলব?

নাসিমা তখন একটা নিঃশ্বাস লুকোলো। অপসৃয়মাণ অন্ধকার আর দূরে দূরে বিজলি আলোর বৃত্তের দিকে তাকিয়ে ভাবল খানিক। তারপর খুব আবছা গলায় বলল, বেবি, মানুষকে আমি চিনি। ওদের স্বভাব শুধু আঘাত করা, আঘাতটাকে উপেক্ষা করতে পারলেই হলো। আর কিছু না। নিজের কাছে যেটা জরুরি মনে হয়, সেইটাই বড়। মানুষ আমাকে কম আঘাত দেয়নি, বেবি। লোকের দেখাটাকে বড় করে দেখলে ঠকতে হয়, নিজের কাছে অপরাধী হতে হয়—- পৃথিবীতে পাপ শুধু এইটেই।

বেবি চুপ করে শোনে। নাসিমা তার নিজেরই উচ্চারণকে বিশ্বাস করবার জন্যে মনে মনে আকুল হয়ে ওঠে।

পালানো, শুধু পালানো। আমার শক্তি নেই তাই বারবার আমি পালিয়ে আসি। মানুষের নিষ্ঠুরতাকে আমি ভয় পাই।

একবার আমি মেরুদণ্ড পেয়েছিলাম—- করাচিতে। কিন্তু মানুষ কত নির্ভরশীল। একটা আনন্দ, কিংবা বেদনা, এমনকি এই শরীরটার জন্যে প্রথমত আমরা জনক–জননীর ওপর নির্ভরশীল। এই দুঃসহ বন্ধনসূত্রকে কেউ কোনদিন এড়াতে পারবে না। নির্ভর করতে হয়েছিল আমাকেও, কিন্তু যার ওপরে আমি সেদিন নির্ভর করেছিলাম সে বঞ্চনা করলো। আমার সে মেরুদণ্ড মোমের মত নত হয়ে এলো সেই বঞ্চনার পর। আমাকে রিক্ত করে দিয়ে গেল।

বেবিকেও হারাতে হবে? শুধু আমি নই, তোমাকেও যে উপেক্ষা করতে হবে—-পারবে না তুমি? নাসিমা স্পর্শ দিয়ে ওকে উপলব্ধি করতে চায়। তার অসীম রিক্ততা প্রাচীন জাহাজের বিশাল পালের মত ফুলে ফুলে উঠতে থাকে তখন। প্রতীক চিহ্নের মত স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে সেই ধূসর থাবা। আছড়ায়। ফেটে পড়বার শক্তিটুকু যেন তার অন্তর্হিত হয়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে রক্তের নদী। অতলে, আরো অতলে, নাসিমা। ক্লান্তির কালো চোখের আরো পেছনে।

.

অনেকক্ষণ ধরে ক্লিফটনের বালুতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে নাসিমা আখতার। হাতের মুঠোয় দলা পাকানো মণিখালার চিঠি। চিঠিটার কথা এখন আর সে ভাবছে না মোটেই।

এক কাপ কাফির তৃষ্ণায় মন উতলা হয়ে ওঠে। ঘরে ফিরে গেলে নিজে বানিয়ে খাওয়া যেত দুপা সমুখে ছড়িয়ে গান শুনতে শুনতে। কিন্তু এত শীগগীর সে ফিরবে না। ফেরে

না কোনদিনই। বরং জওয়াদের কাছ থেকে যতটা দূরে থাকা যায়, ভালো। জীবিকার জন্যে যে চাকরি করা তার, দিনের মেয়াদ শেষ হলে নাসিমা ব্যস্ত হয়ে পড়ে গোটা শহরটা নিয়ে। কোনদিন দোকানে দোকানে শো কেস দেখে কাটায় আবার কোনদিন সমুদ্রসৈকতে মানুষ, একেক দিন আবার উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায় এ পাড়া থেকে সে পাড়া। জড়িয়ে পরবার ভয়। নেই, হোঁচট খাবার সম্ভাবনা নেই, এতে পাওয়ার বিনিময়ে দিতে হয় না কিছুই। অনেক বড় শহরে হারিয়ে যাওয়ার এই নেশা নাসিমার আজো কাটেনি।

বরং রেস্তোরাঁয় যাওয়া যাক। নাসিমা আখতার উঠে দাঁড়ায়।

রেস্তোরাঁয় বসে বসে মণিখালার চিঠির একটা উত্তর মনে মনে দাঁড় করায়। সেটা খানিকটা এমনি

আমি যখন পড়ানোর এই কাজটা নিয়ে করাচি আসি, তখনো তোমার মত নিইনি—-চাটগাঁয়। গিয়েছিলাম সেও আমার নিজেরই ইচ্ছেয়। তুমি যদি আরো বিশদ করে আমাকে জানতে মণিখালা, তাহলে বুঝতে পারতে, আমি আমার ইচ্ছেটাকে কতখানি শ্রদ্ধা করি। এ সব কথা। বলার উদ্দেশ্য তোমাকে আঘাত করা নয়, তুমি যা জানতে চেয়েছ এ তারই উত্তর।

তোমরা ঠিকই শুনেছ জওয়াদের সঙ্গে আমি আজ কয়েক মাস হলো থাকছি। আমাদের বিয়ে হয়নি। শুনে হয়ত অবাক হবে, বিয়ে হবেও না। আমি ওকে ভালোবাসি না। তবু আছি। শুনে হয়ত আহত হবে, আমাকে ঘৃণা করবে, কিন্তু আমি জানি আমি কী করছি।

তুমি হয়ত প্রশ্ন করবে, তাহলে জওয়াদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী রকম? আমি যদি এর কোনো নাম দিই তোমরা বলবে বড় বড় কথা দিয়ে কুৎসিত ব্যাপারটাকে ঢাকছি তাই কোনো নাম দেব না। প্রেম মিথ্যে, মণিখালা যাকে আমি প্রেম বলে থাকি।

অনেক তো দেখলাম, নিজেকে নামিয়ে নিতে পারলাম না কিছুতেই। কিন্তু শেষ অবধি আমি তো আমার কাছে সত্যি?

না, মণিখালা, কানে আঙ্গুল দিয়ো না। আমি জওয়াদকে ভালোবাসি না, ওর মনে যদিও বা কখনো জন্ম নিতে চায় ভালোবাসা আমি তাকে নিষ্ঠুর হাতে দাবিয়ে দি। কেননা ওটাকে বাড়তে দিয়ে নিজে কষ্ট পেতে চাই না।

আরো আমার সুবিধে জওয়াদ–এর মাতৃভাষা সিন্ধি, ওর অনেক কথাই আমি বুঝতে পারব না। মনের কথাগুলোকে তাই আমার জন্যেও কখনোই ফেনিয়ে তুলে প্রকাশ করতে পারে না।

আমার সন্তানকে, যদি সে কোনদিন আসে, আমি ভালোবাসতে পারব এই আশা নিয়ে আছি। মিথ্যে প্রেমের মুখোশের জন্য আমার আর কোনো বাসনা নেই।

তোমাদের আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না, আমি কোনো পাপ করছি না। তাছাড়া বোঝানোর মত মনের দীপ্তিও এখন আমার নেই। জওয়াদ এর চেয়ে বেশি কিছু আমার কাছে চায়নি। অত্যন্ত সহজ, সরাসরি ছিল ওর প্রার্থনা। খুশি হয়েছিলাম আমাকে তা–ই নিযে থাকতে দাও। অনেক ভেবে দেখেছি মন আব শরীর, দুটোকে এক করে দেখলেই যত বিপত্তি—-যা আর দশজন দেখে থাকে। বিপত্তির সম্ভাবনা এখানে নেই বলেই জওয়াদকে নিয়ে আমি তোমাদের মুখোমুখি এত নির্ভীক।

আমাকে ভুলে গেলেই ভালো। আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না। ইতি তোমাদের, নাসিমা।

বেরিয়ে এলো নাসিমা। ঘরে ফিরে দেখল জওয়াদ তখনো আসে নি।

নাসিমা খেয়ে নিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে পড়তে বসলো কালকে যা পড়াতে হবে। জওয়াদ ফিরে এলো, টের পেল তাও। ফিরে এসে কোনদিন তাকে সে বিরক্ত করে না।

আজ জওয়াদ দরোজায় নক করলো।

আসতে পারি?

কাজ করছি।

প্লিজ।

এসো, এক মিনিটের বেশি বসতে পাবে না কিন্তু।

জওয়াদ এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। জওয়াদের ভঙ্গিটাই অমনি। কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বলল, নিঃশ্বাসের উষ্ণতা তার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে, আসবে?

না।

জওয়াদ দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করে না। শুধু বলে, মে আই কিস? প্লিজ, জাস্ট এ পেক ডিয়ার।

অলরাইট।

গালের ওপর ঠোঁট চুঁইয়ে জওয়াদ উঠে দাঁড়ায়। বলে, সাম টাইম আই থিঙ্ক আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ।

শ–স্–স্। ডোন্ট লাই। নাউ গো ব্যাক, রাইট আউট অফ মাই ডোর।

জওয়াদ চলে যায়। জওয়াদ তাকে বিরক্ত করে না, এর জন্য সে অনেক কৃতজ্ঞ। জওয়াদকে তার সহোদরের মত মনে হয়।

সন্তান সম্ভাবনার কথা জওয়াদ জানতে পেরে অবধি কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। ভালো করে। তাকাতে পারে না নাসিমার দিকে। নাসিমা মনে মনে কষ্ট পায়, কী হলো তোমার? মনে মনে স্থির করে তখন, জওয়াদকে ছেড়ে সে চলে যাবে। লোকটা যদি বিব্রত হয়ে থাকে, তাকে মুক্তি দেয়াই ভালো। মনে রাখব তাকে, আমার সন্তানের জন্য তার ওপর আমি নির্ভর করেছিলাম। ও যা নেবার নিয়েছে, আমার যা পাওয়ার পেয়েছি। আর কোনো সম্পর্ক না থাকাই ভালো।

চলে যাওয়ার কথাটা স্পষ্ট করে নাসিমা বলার আগেই জওয়াদ বুঝতে পেরেছিল। ক্ষুব্ধ একটা মুখভঙ্গি করে বলেছিল, জানি না কী তোমার হয়েছে। একেক সময় আমার মনে হয় তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন। কোনদিন তুমি জানতে চাইলে না আমি তোমাকে ভালবেসেছি কিনা

প্রয়োজন এই শব্দটা তখন বড় সুদূর মনে হয়েছিল নাসিমার, এমন কি এর অর্থটাও যেন তার কাছে স্পষ্ট নয়। আর আরাম চেয়ারে শরীর এলিয়ে দূরে দরোজার কাছে দাঁড়ানো জওয়াদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল অন্য কোনো মানুষের জন্য এই মানুষটার অনুভূতি সে শুনছে এক পরম আলস্যে। জওয়াদ বলে চলেছে,

—-আমাকে ছেড়ে যেও না। প্লিজ স্টে উইথ মি।

তখন আরো কষ্ট হয়েছিলো লোকটার জন্যে। অনেকদিন পরে নিবিড় করে কারো জন্যে কষ্ট হলো তার। আর সেই কষ্টটা কেমন ছায়া ছায়া, সচকিত।

আজ তার এই আসন্ন পূর্ণতার মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো কোণে সামান্যতম কোন বেদনাও অসহনীয়। বলল, অলরাইট। ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু স্টে, আই উইল। ইউ মেড মি ব্রিদ এগেন, আই উড নেভার মেক ইউ আনহ্যাপি। ইয়েস আই উইল স্টে।

কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় যে আমার মন আকণ্ঠ ভরে উঠেছে, জওয়াদ। কোনদিন তুমি জানতে চাওনি, জানবেও না, কেন আমি তোমার ক্ষুধার হাতে একদিন নিজেকে তুলে দিয়েছিলাম। আমার তৃষ্ণার রূপ তুমি কোনদিন বুঝতে পারবে না হয়ত।

আমি তোমাকে আর কাছে আসতে দেব না, দূর থেকে তুমি আমার প্রীতিভাজন হয়ে থাকবে।

জওয়াদ, আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও।

.

কিন্তু স্মৃতি একটা পশুর মত ছড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে, পায়ে পায়ে—-আলোতে, অন্ধকারে, পৃথিবীতে, পৃথিবীর অন্তিমে কোটি কোটি শূন্যতায়।

পৃথিবীতে মানবজন্মের পাওনা কি শুধু থুতু আর কাদা? আঘাতের পর আঘাত নাসিমাকে অদ্ভুত রকমে বিজ্ঞ করে দিয়ে গেছে।

.

সব উঁচু সিঁড়ি থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে পড়তে দুঃস্বপ্নের মত নাসিমার চোখে নেমে এলো জওয়াদের এই কদিন পালিয়ে বেড়ানো, যমকালো মুখ আর কপালের ত্রিশূল। মুখটা অস্পষ্ট হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল। শৈবালের মত থোকা থোকা অন্ধকারে ঢেকে গেল তার সমস্ত চেতনা।

বিকেলে নাসিমাকে জওয়াদ বলেছিল, কতদিন তোমার সঙ্গে বেরোইনি আজ বেরুবে?

এই সামান্য প্রশ্রয় দেয়ার লোভটুকু সে সামলাতে পারেনি। বলেছে, তুমি যদি চাও, বেশতো।

তারপর সেরে নিয়েছে স্বল্পপ্রসাধন। মাতৃত্বের বীজে ফুলে উঠেছে সে। অনেকক্ষণ ধরে শাড়িটা ঠিকমত পরে নিয়ে বলেছে, চল আমি তৈরি।

তারপর একটু ঠাট্টা করবার আগ্রহে কপট কণ্ঠে—- হোয়াই! ইউ লুক লাইক এ নটি বয়, ডিয়ার। ইউ শুড হ্যাভ কম্বড ইওর হেয়ার ডিসেন্টলি অ্যান্ড ইন দোজ ব্যাগি প্যান্টস! হেভেনস্!

জওয়াদ চকিতে নিজের দিকে তাকিয়ে দ্রুত কিন্তু সংক্ষিপ্ত হেসে উঠেছে। আজ কয়েকদিন হলো জওয়াদের হাসিগুলো এমনি সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে কেন যেন। বদলে নাসিমা কিন্তু হাসলো তার সারা শরীরে ঝিলমিল তুলে।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নামতে গিয়ে ওই দুর্ঘটনা।

জ্ঞান যখন ফিরলো তখন বুকের ওপর ঝুঁকে পড়া ডাক্তারের মুখ দেখে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল নাসিমা। মুখটা প্রথমে মনে হয়েছিল পাথরের ওজনের মত—- নত হয়ে আছে। বিপজ্জনক রকমে সূক্ষ্ম একটা সুতো থেকে। ডাক্তার তখন ডান হাত শূন্যে হাওয়ায় তুলে বলল, ডোন্ট রাইজ, মাদাম।

সেই হাতটা দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতে ফিসফিস করে তখন সে উচ্চারণ করেছে, হোয়াই আই অ্যাম হিয়ার, ডক্টর?

ইউ ওয়ার ইল। ইটস অলরাইট নাউ। প্লিজ ডোন্ট টক। ইওর হাজব্যান্ড উইল কাম ইন দ ইভনিং।

আশ্চর্য রকমে কান্নার উৎস আজ তার শুকিয়ে গেছে। মথিত একটি মুহূর্ত অতিক্রম করে রুক্ষ কর্কশ, ফিসফিস কণ্ঠে সে বলল, আই নো ইটস নট অলরাইট, ডক্। ইউ কুড নট সেভ মাই বেবি।

.

জওয়াদ সেদিন বিকেলে আসেনি। এসেছে পরদিন। কিংবা কবে এসেছে তা আজ মনে পড়ে

নাসিমার। শুধু মনে পড়ে রাত্রে •ার্সের দেয়া দুধ মুখে দিয়ে হঠাৎ বিবমিষায় দুচোখে আঁধার দেখতে দেখতে তার আত্মা থেকে এক চিৎকার উঠেছে। তুমি কেন এমন করলে? তুমি কি ভয় পেয়েছিলে আমি তোমাকে নিষ্ঠুর একটা বিপদে ফেলব? তাই কি তোমার মুখোশ ছিল আমাকে ধরে রাখতে? তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম।

নাসিমাকে সিঁড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল জওয়াদ।

.

রাতে নাসিমা উঠে এসে জওয়াদের কামরায় ঢুকলো। জওয়াদ ঘুমিয়ে আছে।

হঠাৎ হাসি পেল নাসিমার ঘুমোনো এই মানুষটার দিকে তাকিয়ে। ঘুমোলে এত অসহায়, এত উদ্যমহীন মনে হয় মানুষকে?

দৃষ্টি থেকে শেষ দ্বীপটি নিমগ্ন হয়ে গেলে থাকে শুধু মৃত্যুর মত বিশাল দিগন্ত। তখন যেদিকেই তুমি যাও, একই। কোনো প্রেক্ষিত নেই, ধ্রুব নেই—- আছে শুধু হওয়া এবং না—- হওয়ার ভয়াবহ মধ্যবিন্দু। হাসলো না নাসিমা আখতার। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু। এমন কি জওয়াদকেও সে যেন আর দেখছে না দেখতে পাচ্ছে না। আস্তে আস্তে কেমন অবাস্তব, অস্তিত্বহীন হয়ে আসছে সবকিছু। পেছনে সরে যাচ্ছে। জওয়াদ হঠাৎ চোখ মেলে তাকিয়ে চমকে উঠল ভূগ্রস্তের মত। কী ভীষণ দৃষ্টি তাকে বিদ্ধ করছে!

লাফ দিয়ে উঠে নাসিমার বাহুমূল ধরে ঝাঁকি দিয়ে সে বলল, নাসিমা নাসিমা।

নাসিমা তখনো তেমনি তাকিয়ে আছে। যেন এই স্পর্শ জড়িয়ে আছে কোনো পাথরের গায়ে। তখন ভয় পেল জওয়াদ। ভীষণ একটা ভয়ে তার মুঠো শিথিল হয়ে এলো। ঠিক সেই দম আটকানো মুহূর্তে নাসিমা স্বপ্নের মত উচ্চারণে বলল, ইউ আর অ্যাফ্রেড, লিটল বয়।

জওয়াদ হাত নামিয়ে নিল। মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল, হোয়াট!

নাসিমা তখন ছেলেমানুষের মত দুহাত নাভিমূলের কাছে মুঠো করে ধরে শরীরটাকে সি সর মত দোলাতে দোলাতে বলল, মাই মাদার কেম টু মি টু নাইট। শি সে আই মাস্ট নট প্লে ইন দ সান। ইট ইজ সামার দেয়ার হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে

—-এভার সিন এ স্লিপিং টপ? মাই বিগ ব্রাদার ক্যান ডু দ্যাট। আই কান্ট। ক্যান ইউ? বাট ইউ আর অ্যাফ্রেড টু নাইট হাউ ক্যান ইউ।

নাসিমা খিলখিল করে হেসে উঠে হঠাৎ ভাবনায় ডুবে গেল। মাথাটা একটু বাঁকিয়ে দৃষ্টি দূরে সরিয়ে, অনেক সুদূরে, কী যেন ভাবতে লাগল।

হোয়াটস দিস ফান?

ইয়েস, বুলি মি—- ইয়েস, গো অন।

জওয়াদ এতক্ষণে তার চোখের তারা থেকে কী যেন আবিষ্কার করতে পারে। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করতে চায়, ইউ আর নট হিউম্যান।

বলতে পারে না। আমতা আমতা করতে থাকে। এক পা পিছিয়ে দাঁড়ায়। ভয় করতে থাকে, এ কার সঙ্গে এতকাল সে কাটিয়েছে? আজ নতুন করে যেন তাকে চিনতে পারল। ঠিক চিনতে পারল না, যাকে সে এতকাল চিনত সে বদলে গিয়ে এখন এমন

একটা মানুষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে যাকে সে কোনো দিনই দেখেনি। হঠাৎ নাসিমার মনে হলো লোকটা কালো ভীষণ ভয়াবহ কালো হয়ে যাচ্ছে

লুক হি ইজ অ্যাফ্রেড। নো নো নো।

চিৎকার করে জওয়াদের পায়ের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল নাসিমা আখতারের থরথর করে কেঁপে ওঠা শরীর।

.

বেবির হাতের উষ্ণতায় নিজের করতল উত্তাপে রক্তিম করে তুলতে চায় নাসিমা। একজিবিশনে মেরি গো রাউন্ডের দ্রুতচক্র আলোর বিক্ষিপ্ততায় দাঁড়িয়ে নাসিমা আখতার বেবির দিকে তাকিয়ে বলে, আজ রাতে তুই আমার ওখানে থাকবি। কেমন?

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা
১৯৫৯